

# দ্বি-মাসিক শরীয়াত

রমযান, শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরী, প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা-৩

## نَحْنُ لِلتَّائِبِينَ فَرَاءُ



# বের হয়েছে শরীয়তের তৃতীয় সংখ্যা !!

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও  
মাসিক শরীয়ত এর ৩য়  
সংখ্যা পাঠকের হাতে তুলে  
দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।  
শরীয়ত এর প্রচুর অব্যাহত রাখতে  
আমরা বদ্ধপরিকর। বাকি আল্লাহ  
তাওফিক দাও।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাজারে  
এত মাসিক, পত্রিকা, সাপ্তাহিক,  
সাময়িকী থাকা সত্ত্বেও শরীয়ত  
কি নতুন কোন কিছু দিতে চাইছে  
নাকি?

হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা মনে করি,  
এত এত পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও  
শরীয়ত এর প্রয়োজন রয়েছে।  
শরীয়ত এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যদি  
বলতে হয় তাহলে বলব, এর  
উদ্দেশ্য হচ্ছে- ফেৎনায় আবদ্ধ  
নিমজ্জিত এ সময়েও যে  
ইসলামী শরীয়ার ইনসামাজিক  
শাসননীতি ও বিধি-বিধান  
বাস্তবায়নের আবেদন ও  
উপযোগিতা সঠিকভাবে মৌজিক  
ও সম্ভব— তাই তুলে ধরা।  
উম্মাহকে তুলে মাওয়া অতীতের  
সোনালীস্মৃতির সাথে যুগবদ্ধ করা।

বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার কাছে  
আশা রাখি, কুছাট উম্মাহকে  
পুনরায় সোনালী-কাফেলায় যুক্ত  
করার এ প্রয়াসে আমরা তাঁদের  
সহযোগিতারূপে পাব।



## নিজে পড়ুন, অন্যকে উপহার দিন

# نحو الشريعة فداء



# শরিয়াতে

দ্বি-মাসিক

রমযান, শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরী, প্রস্তুতিমূলক সংখ্যা-৩

## সম্পাদক

মুফতী হাসান ইমতিয়াজ

## সহযোগী সম্পাদক

মাওলানা মুয়াজ বিন মুহসিন

## ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

আব্দুল্লাহ আফনান

## ডিজাইন বর্ণবিন্যাস

সাইফুল্লাহ

শুভেচ্ছা মূল্য : ৪০ টাকা

যোগাযোগ :

[muftihasanimtiaz@yahoo.com](mailto:muftihasanimtiaz@yahoo.com)

[www.shoriotmagazine.wordpress.com](http://www.shoriotmagazine.wordpress.com)

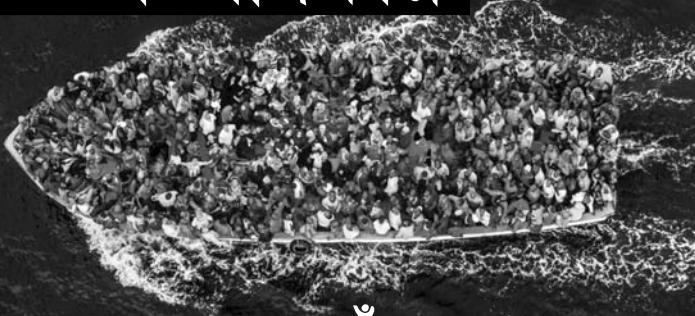
মগবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

## সূচি

- ৪ মানবতা বেঁচে থেকো!
- ৫ দারসুল কুরআন
- ৬ দারসুল হাদীস
- ১৩ দারসুল ফিকহ
- ১৬ দারসুত তাযকিয়াহ
- ১৭ হেকমত ও মাসলাহাত যখন প্রিয় নবীর নির্দেশনার পরিপন্থি
- ১৯ এ যুগের সবচে' কঠিন ইবাদত জিহাদ
- ২০ রমজান: রহমাত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস
- ২২ রমজান ও আকাবেরে উম্মাহ
- ২৮ রমজান ও জিহাদ
- ২৯ লাক্ষিত জাতি আর মজলুমের কান্না: এমন তো হবার কথা ছিল না ...
- ৩২ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.  
-এর ঐতিহাসিক ফতোয়া: ভারত 'দারুল হরব'
- ৩৩ আপনার ছেলে-মেয়েরা আমার সিঁড়িঘরে কী করে?
- ৩৫ বনি ইসরাইলের বারসিসা এবং আমাদের গল্প...
- ৩৮ নাস্তিকরা কেন রাসূল সা. কে অপছন্দ করে ?
- ৩৯ মুসলিম উম্মাহর হীনমন্যতা ও দুর্বলতা: কারণ ও উত্তোরণের উপায়
- ৪৩ নাস্তিকের যুক্তির দৌড়নাস্তিকের যুক্তির দৌড়
- ৪৪ বস্ত্রনির্ভরতা যেভাবে আমাদের সাথে বার বার প্রতারণা করলো!
- ৪৫ কিছু প্রশ্ন আছে যা খুব সরলভাবে মনে ঘুরপাক খায়
- ৪৬ সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী রাযি.-এর জীবনের পাতা থেকে
- ৪৯ সুফিয়ান সাওরী: এক নির্ভীক কণ্ঠ
- ৫০ ভারতের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার স্বার্থে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া ও আমার উপলব্ধি
- ৫১ গুয়াত্তানামো বন্দীশালার কারারক্ষী টেরি হোব্জকের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী
- ৫৩ বন্ধু! কেমন যেন হয়ে গেছি...
- ৫৫ গত রমজানেও আমি তোমাদের সাথে ছিলাম!!
- ৫৬ মুসলিম নারীর রমযান পরিকল্পনা
- ৫৮ আসুন সাহাবাদের জীবন দেখি, জীবন গড়ি
- ৬১ আপনার জিজ্ঞাসা ও আমাদের জবাব
- ৬৫ উম্মাহ জেগে উঠেছে



# সম্পাদকীয়



## মানবতা বেঁচে থেকো!

গত মে মাসের প্রথম দিক থেকে মাসব্যাপি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যে খবরটি ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে তা হল- রোহিঙ্গা মুসলিম ও বাংলাদেশী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সাথে সভ্য পৃথিবীর চরম অসভ্য ও ঘৃণ্য আচরণের তাজা সংবাদ। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে যে তথ্য উঠে এসেছে তা এক কথায় লোমহর্ষক। মানুষ কীভাবে এত নীচে নামতে পারে? কর্মসম্পাদনী হোক কিংবা অপহৃত হোক এসব অভিবাসীদের কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় বিশেষ করে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী সিভিকিট। আলাদিনের জাদুর প্রদীপের ন্যায় দ্রুত ধনী হওয়ার সহজতম উপায়। জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে ক্ষমতাসীনদের একাধিক জনপ্রতিনিধির নামও উঠে এসেছে। রাষ্ট্রের উপর মহল থেকে সামান্য ট্যাক্সিচালক, নৌকার মাঝি পর্যন্ত এহেন জঘন্য অপকর্মে জড়িত। খবরে প্রকাশ- শুধু বাংলাদেশেই ২০১২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মানব পাচারে ২৫ কোটি ডলার লেনদেন হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভিত্তিক 'অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ফর্টিফাই রাইটসের' তথ্য মতে এই অঞ্চলে ২০১২ সাল থেকে মানব পাচার জোরদার হয়। শুধু গত মে মাসের ৭ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যেই থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার উপকূল থেকে অন্তত তিন হাজার বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বলেছে, আরো ছয় থেকে আট হাজার অভিবাসী সাগরে ট্রলারে ভাসছে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এসব অসহায় মানুষদের তীরে ভিড়তে দিচ্ছে না। শুধু মে মাসের ১৫ দিনে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় শতাধিক গণকবরের সন্ধান মিলেছে। ২২ মে থেকে এ পর্যন্ত এক মালয়েশিয়া সীমান্তে ১৩৯ টি গণকবর ও ২৮টি বন্দিশিবিরের সন্ধান মিলেছে। ১৩৯টি গণকবরের ১টিতেই প্রায় ১০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাছাড়া বন্দিশিবিরগুলোর আশেপাশে গুলির খোসা ও নির্যাতনের নানা উপকরণ পাওয়া গেছে- যা অভিবাসী অসহায় মানুষদের উপর যে পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হত তার স্পষ্ট প্রমাণ। যারা মারা গেছেন তারা না হয় মানুষের এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। কে জানে কতটা দুঃখ-কষ্ট আর ঘৃণা বৃকে চেপে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন! কিন্তু যারা এখনও বেঁচে আছেন তাদের সাথে আমরা কী আচরণ করছি? সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কেউই এ ক্ষেত্রে মানবিকতার পরিচয় দেয়নি। এসব অসহায় মানব-সন্তান দিনের পর দিন উত্তাল সাগরের ছোট্ট শিপে গাদাগাদি করে অকূল সমুদ্রে ভেসে বেরিয়েছে। জঠর যন্ত্রণা সহ্যে না পেরে খাবার চাইলে দালালেরা তাদের উত্তাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, এদের শুধু টাকার প্রয়োজন; টাকা দিবে না তো বেঁচে থাকার অধিকার তোমাদের নেই। এ তো গেল দালালচক্রের কথা। কিন্তু সভ্য জগতের আমরা তাদের সাথে কী আচরণ করলাম? যেখানে বিবেকের তাড়নায় প্রথমেই এদের আশ্রয়ের তডিৎ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল, সেখানে আমরা অস্ত্রের নলটিই প্রথম তাক করেছি। মাঝিমাঝি বিহীন ট্রলারগুলোকে গভীর সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছি। কিছু দিন পর- মানবিকতার টানেই হোক বা ধিক্কার থেকে বাঁচার জন্যই হোক- উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়। তবে এত দিনে অনেকেই মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যারা কই

মাছের প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিল তাদের অবস্থা একটু শুনুন! ১৮ মে তাদের কথা মিডিয়ায় এসেছে- খাবার নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১০৪। কতটা অনাহারী হলে নিশ্চয় মানুষও বাঁচার জন্য মারামারি করার জোর পায়!!

বাংলাদেশের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী স্বদেশী অভিবাসীদের ব্যাপারে বলেছেন, 'এরা অবৈধ অভিবাসী। এদের নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা নেই। আমরা বৈধ অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করি।' বাহ! চমৎকার বয়ান! মাননীয় মন্ত্রী দয়া করে বলবেন কি- কেন এসব মানুষ মৃত্যুবৃত্তি নিয়ে প্রিয় দেশ ছেড়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে পারি জমাচ্ছেন? জানি, প্রশ্নটার উত্তর আপনারা দিবেন না। কারণ, এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ফুরসত আপনারদের কই? আপনারা তো দেশের উন্নয়নের চিন্তায় গলদঘর্ম হচ্ছেন। এ দেশে যদি চাকুরি পাওয়া যেত, ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেত তাহলে কেন মানুষ ভয়ঙ্কর এ পথ বেছে নেয়? আর প্রতিবেশি দেশের নিপীড়িত মানুষগুলোর কথা কী বলবো? জাতিসংঘ বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘু হল রোহিঙ্গা মুসলমানরা।

এই যে এখন তাদের নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে; 'এরা নির্যাতিত'- তো এদের নির্যাতন বন্ধের কোন শক্তিশালী, কার্যকরী পদক্ষেপ আমার নিয়েছি? নেইনি। মায়ানমারের সামরিক জাভা ও হিংস্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় এদের উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে তা বন্ধের কোন উদ্যোগ আমরা নেইনি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একাধিক বার মায়ানমার এসেছে; কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেনি; বরং যাদের হাতে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে তাদেরই প্রশংসা করে গেলেন।

গণতন্ত্রের জন্য অং সান সূচীকে পুরস্কৃত করা হল। কী করেছেন তিনি মুসলিমদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য? - একটি কথাও বলেননি।

মিডিয়ার কথা যদি বলি তাহলে জাতির 'জাঘ্রত বিবেকে'র তকমা ঝুলিয়ে মানবতার জন্য কাজ করে যাওয়া সংবাদ-মাধ্যমের আসল চরিত্রই উন্মোচিত হবে। এরা সবাই রোহিঙ্গা অভিবাসীদের দুঃখের কথা বলছে; কিন্তু তাদের দুঃখের মূল কারণটাই বলার সংসাহস অনেকেই করছে না। কারণ, এখনও মায়ানমারে চলছে গণহত্যা। নারী-শিশু কেউ রক্ষা পাচ্ছে না হিংস্র বৌদ্ধদের হাত থেকে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে; কিন্তু এর কোন তথ্য মিডিয়ায় আসছে না কেন? কারণ, বিশ্ব মোড়লরা যদিও রোহিঙ্গা পাচারের কথা প্রচার করতে দিচ্ছে; কিন্তু তারাও চায় না রোহিঙ্গা মুসলমানরা শান্তিতে থাক, এদের অধিকার নিশ্চিত হোক। এ সরল সত্য কথাটিই আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের নিজেদেরই ভাবতে হবে, কী করে এ সমস্যা থেকে স্থায়ী সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায়? এ ক্ষেত্রে রাসূল স. এর বাণী আমাদের জন্য হতে পারে প্রেরণা- উদ্দীপনার উৎস। রাসূল স. বলেছেন, 'মুসলমান একে অপরের ভাই। পুরো মুসলিম জাতিই যেন এক দেহ, এক প্রাণ। এক অঙ্গ আক্রান্ত হলে পুরো সত্তায় তার ব্যথা অনুভূত হয়। তার জন্য নির্যম রাত কাটায়।'

বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক ও দাঈ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এ হাদীসের প্রসঙ্গ টেনে লিখেন- 'যতদিন মুসলমানদের মাঝে এ ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ছিল ততদিন কোন শক্তি সাহস পায়নি তাদের উপর সৈন্য দৃষ্টি নিক্ষেপের; কিন্তু যখন মুসলমানরা ভৌগোলিক সীমানায় জড়িয়ে গেছে, ভাষাকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা লালন শুরু করেছে- কেউ আরব জাতীয়তার পতাকা তলে একত্রিত হয়েছে, কেউ নিজ দেশের সীমানাকে সবকিছুর পার্থক্য-নির্ণায়ক ধরে নিয়েছে, তখনই তারা শত্রুদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। ঠিক নেকড়ে আর গরুর গল্পের ন্যায়।

প্রিয় উম্মাহ! আসুন, আমাদের মুক্তি ও অধিকার আদায়ের জন্য অন্যদের কাছে ভিখারীর মত হাত না পেতে বুক টান করে তাদের বলি- তোমাদের সাথে আমাদের কথা হবে এখন থেকে শক্তির ভাষায়! কারণ, শক্তির যুক্তি সবাই শুনবে। কবির ভাষায় বলি- ওরে হাত পেতে নয় জোর করে আজ নিতে হবে অধিকার। হ্যাঁ, অসহায় নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য এটাই আজ বড় প্রয়োজন।





## দারসুল কুরআন

আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না,  
যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে  
বিচারক নির্ধারণ করে



﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। -সূরা নিসা: ৬৫

উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল-

: أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففضى للمحق على المبطّل ، فقال المقضي عليه : لا أَرْضَى . فقال صاحبه : فأتريد ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق ، فذهبوا إليه ، فقال الذي قضى له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففضى لي فقال أبو بكر : فأتنا على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى ، قال : أتأتى عمر بن الخطاب ، فأتياه ، فقال المقضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ففضى لي عليه ، فأبى أن يرضى ، ثم أتينا أبا بكر ، فقال : أتنا على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى أن يرضى فسأله عمر ، فقال : كذلك ، فدخل عمر منزله وخرج والسيوف في يده قد سله ، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى ، فقتله ، فأنزّل الله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) إلى آخر الآية (تفسير ابن كثير)

‘দুজন লোক রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে তাদের বিবাদের মিমাংসা করতে আসল। রাসূল সা. হকের পক্ষে বাতিলের বিপক্ষে ফায়সালা করলেন। কিন্তু যার বিপক্ষে রায় ছিল সে বলল, এ বিচার আমার মনঃপুত হয়নি। (আমি এ বিচার মানি না)। তখন তার সাথি বলল, ‘তাহলে তুমি কী চাও?’ সে বলল, আমরা আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর নিকট যাব। অতপর তারা হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট গেলো এবং যার পক্ষে রায় ছিল সে বলল, আমরা রাসূল সা. এর নিকট বিচার চেয়েছি। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। আবু বকর রাযি. বললেন, তোমাদের উপর

ঐ ফায়সালা যা রাসূল সা. তোমাদের ব্যাপারে করেছেন। তখন তার সাথি বলল আমি এতে সন্তুষ্ট নই। আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর নিকট যাবো। অতপর তারা তার নিকট আসল এবং যার পক্ষে রায় ছিল সে বলল, আমরা রাসূল সা. এর নিকট আমাদের মাঝে সৃষ্ট বিভেদের মিমাংসা চেয়েছি তিনি আমার পক্ষে এবং তার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। অতপর আমরা আবু বকর রাযি. এর নিকট আসলাম তিনি বললেন, তোমাদের উপর ঐ ফায়সালা যা রাসূল সা. করেছেন। কিন্তু সে তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তখন ওমর রাযি. অপর ব্যক্তির নিকট একথার সত্যতা জানতে চাইলে সে অনুরূপ কথাই বলল, যা তার সাথি বলেছে। তখন ওমর রাযি. তার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং হাতে কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে বের হলেন এবং ঐ ব্যক্তির মাথায় আঘাত করলেন যে রায় মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

আল্লাহ ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেন:

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الاتقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: { ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كلياً من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة.

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে ফায়সালা প্রদান করেন তা হক বলে গণ্য হবে, বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তারই আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। আর এ জন্যই তিনি বলেছেন, ‘অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে তারা নিজেদের



অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে” অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে। আপনি যে ফায়সালা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরণের বাক-বিতণ্ডা বা বিরোধিতা ব্যতীত তা পূর্ণরূপে মেনে নিবে। -তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯

হাকীমুল উম্মত আঈমান আজ-জাওয়াহেরী (দা.বা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فإذا زعم قوم أو جماعة أو شعب أو دولة أو حكومة أو نظام أنهم مسلمون يتبعون أحكام الإسلام، فلا بد أن يكونوا مسلمين بحق التشريع والحكم لله سبحانه. وإذا زعم أي من تلك الفئات أنهم فئة مسلمة، ولكنهم لا يسمون بحق التشريع والحكم لله سبحانه وتعالى، ولا يحكمون شريعته في قضاياهم، فقد حكم عليهم القرآن حكماً بيناً، أنهم لا نصيب لهم من الإيمان. يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا وَزَعْمِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

‘যখন কোন জাতি, দল, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র বা প্রশাসন অথবা কোন সংগঠন দাবী করবে- তারা মুসলমান, ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণকারী; তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হবে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার আইন ও বিধান প্রণয়নের হক্কে মেনে নিবে। যদি তাদের মধ্য থেকে কোন গোষ্ঠী দাবী করে তারা মুসলমান, কিন্তু আইন ও বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক্কে মেনে না নেয়, এবং তারা তাদের মাঝে সংঘটিত সমস্যায় আল্লাহর শরীয়তকে ফয়সালাকারী হিসেবে নির্ধারণ না করে তখন কুরআনই তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট ফয়সালা দিয়ে দেয় যে, তাদের সামান্যতম ঈমানও নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ‘কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।’ -সূরা নিসা: ৬৫, (আস-সুবহ ওয়াল-কিনদীল, অধ্যায়: প্রথম, পৃষ্ঠা-১)

**নির্দেশনা : উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়- বিধান দানের ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে মহান আল্লাহর। সুতরাং যে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তার আবশ্য কর্তব্য হবে- যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসায় শরিয়ার ফায়সালা মাথা পেতে নেয়া। এ ক্ষেত্রে গড়িমসি করা, কিংবা বিদ্রোহ করার অর্থ- ধর্মহারা হয়ে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হওয়া।**



## জিহাদ: নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সমন্বয় কামা

-শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আজিজ

এখলাসের অর্থ হল, একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করা। আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছু থেকে ইবাদতকে মুক্ত রেখে এবং সবধরণের দুনিয়াবী-স্বার্থ পরিত্যাগ করে নিয়ত পরিশুদ্ধ করা।

তো এখলাসের সার কথা হল: নিয়ত ও আমলকে শিরকের সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত করা।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, ‘নিশ্চয় আমল নিয়ত হিসেবে যাচাই হয়। আর মানুষ নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পায়। সুতরাং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের বলেই পরিগণিত হবে। আর যে দুনিয়া হাসেল কিংবা রমণীর পানি প্রত্যাশায় হিজরত করবে তাহলে তার হিজরত সে জন্যই ধর্তব্য হবে। -বুখারী, মুসলিম

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل ليرى مكانه؟ - للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليبرى مكانه؟ - وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاقل حمية - فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»

হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল সা. এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সা.! মানুষ গণীমত



লাভের আশায় যুদ্ধ করে, প্রসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে। খ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে। অন্য বর্ণনায় আছে, বাহাদুরী জাহিরের জন্য যুদ্ধ করে, আত্মমর্যাদার জন্য যুদ্ধ করে এদের কে প্রকৃত মুজাহিদ? রাসূল সা. বলেন, যে আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার নিমিত্তে যুদ্ধ করল সে-ই প্রকৃত মুজাহিদ। -বুখারী, মুসলিম

সামরিক প্রশিক্ষণ মূলত জিহাদের প্রারম্ভিক কাজ এবং এটাও উদ্দিষ্ট বিষয়। প্রশিক্ষণার্থী মুজাহিদ এতে গুরুতর আহত এমনকি শহীদ হওয়ারও ঝুঁকিতে থাকেন সর্বক্ষণ। সুতরাং তার উচিৎ হল, প্রশিক্ষণ নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের নিয়ত পরিশুদ্ধ করা এবং একমাত্র জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ নেয়া- যার মাধ্যমে জমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হবে। যেন প্রশিক্ষণের বিনিময়ে তার আমল নামায় পূর্ণ সওয়াব লিখিত হয়। কারণ, মুজাহিদের জন্য সওয়াবের প্রতিশ্রুতি এ শর্তের সাথে সংযুক্ত যে, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড হবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য।

সতরাং, মানুষ বীর বাহাদুর বলে সম্বোধন করবে এজন্য প্রশিক্ষণ নেয়া কিংবা জিহাদ করা কিছুতেই কাম্য নয়। কিংবা এ উদ্দেশ্যে জিহাদে শরীক হওয়া উচিৎ নয় যে, নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলে মানুষ সম্মান করবে, যুগশ্রেষ্ঠ বীর বলবে। কারণ, রাসূল সা. বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتي به فعرفه نعمته فعرّفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسُجِبَ على وجهه حتى أُلقي في النار»

কেয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম এমন ব্যক্তির বিচার সম্পাদন করা হবে, যে কিনা শহীদ হয়েছিল। তাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার উপর কৃত নেয়ামতরাজির বর্ণনা দিবেন। সে তা স্বীকার করে নেবে। অতঃপর মহান আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তো দুনিয়াতে তুমি কী নেক কাজ করলে? সে বলবে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে করে জীবন বিলিয়ে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এ জন্যই যুদ্ধ করেছিলে যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। তা তো তুমি লাভ করেছ। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হবে। ফলে তাকে টেনে হেঁচড়ে তাতে নিক্ষেপ করা হবে। -মুসলিম

আর্থিক লাভ কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তি, সুখ্যাতির কামনায়ও জিহাদ বা প্রশিক্ষণে অংশ নিবে না। কেননা, হতে পারে এসব বৈষয়িক স্বার্থ লাভের পূর্বেই তার মৃত্যু এসে পড়েছে। তাহলে তো দানয়া আখেরাতে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হল। আর এটা হবে স্পষ্ট সর্বনাশ।

রাসূল সা. এরশাদ করেন,

«ما ذئبان جائعان أُرسلوا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»

দুটি বুভুক্ষ নেকড়ে বকরীর পালে হামলে পড়ে যতখানি ক্ষতিসাধন করতে পারে ধন-সম্পদ ও খ্যাতির অভিলাষ ব্যক্তির দীন-ধর্মকে তারচে' বেশি ক্ষতিসাধন করে। -তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ।

হাদীসের ব্যাখ্যা এমন- ধন সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অভিলাষ মানুষের দীন ধর্মের-যতখানি ক্ষতি সাধন করে বুভুক্ষ নেকড়েও বকরী-পালের ততখানি ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এবার তাহলে বুঝুন এ দুটি মানুষের কতটুকু ক্ষতি করে?

তদ্রূপ কোন মুসলমানের নির্দিষ্ট কোন জামাত বা দলের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে জিহাদ বা প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া অনুচিত। ভাব খানা এমন যে, যে দলের প্রতি পূর্ব পরিচয় ছিল সে দল ছাড়া অন্য কারো সাথে জিহাদ করতে প্রস্তুত না। তাহলে এটাও একমাত্র আল্লাহর দীন সমুন্নত করার জন্য হচ্ছে না; বরং নিজ দল বা সংগঠনের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এহেন কর্মকাণ্ড জাহিলিয়াতের গৌড়ামিপনারই অন্তর্ভুক্ত। যার সম্পর্কে প্রিয় নবী সা. স্পষ্টভাবে বলেছেন,

«ما بال دعوى الجاهلية؟.. دعوها فإنها مُنتنة»

কী হল তোমাদের? তোমরা দেখছি জাহিলিয়াতের ভাষায় ডাকাডাকি করছ? এসব ছাড়? এ তো পুঁতিগন্ধময় বিষয়। -বুখারী

রাসূল সা. আরো বলেছেন,

«من قُتِل تحت راية عُيَّة يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية»

'যে ব্যক্তি কোন পথভ্রষ্ট দলের ঝাণ্ডাতলে লড়াই করে নিহত হল, আত্মমর্যদায় অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রোধান্বিত হল, এজন্য লড়াই করল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।' মুসলিম

এক হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন,

«إن الله عز وجل سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের মাধ্যমেও দীনকে শক্তিশালী করেন আখেরাতে যাদের কোন অংশ থাকবে না। -মুসনাদে আহমাদ,

তাবারানী এ শ্রেণীর মানুষ রাসূল সা. এর সময়ও ছিল। যেমন এক হাদীসে এসেছে- এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর সাথে যুদ্ধে গেল। বীরদর্পে যুদ্ধ করে আহত হল। তবে যখম-যাতনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল...।-বুখারী

মুসলিম শরীফে হযরত ওমর রাযি. থেকে একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد و فلان شهيد و فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها - أو عباءة

খায়বার যুদ্ধের দিন সাহাবীরা যুদ্ধ শেষে ময়দান থেকে এঁসেঁ বলাবলি করছিল, ‘ওমুক শহীদ হয়ে গেছে।’ তখন রাসূল সা. বললেন, ‘কখনো নয়; বরং সে গনীমতের চাদর আত্মসাৎ করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি।’ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

كان عليّ ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كزكرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. والثقل هو العيال وما يثقل حمله من الأمتعة،

কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর মাল-সামান্য বহনের দায়িত্বে ছিল। ঘটনাক্রমে সে মারা গেল। তখন রাসূল সা. বললেন, সে জাহান্নামী। একথা শুনে লোকেরা তাকে দেখার জন্য গেলে পরে তার কাছে একটি চাদর পরে থাকতে দেখল, যা সে আত্মসাৎ করেছিল।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী লিখেন, এ ব্যক্তি কৃষ্ণবরণ ছিল। সে যুদ্ধের ময়দানে রাসূল সা. এর বাহনের লাগাম ধরে রাখত, অথচ সে গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎের অপরাধে জাহান্নামী। রাসূল সা. এর যুগে মুনাফিকরাও যুদ্ধে বের হত। যেমন- বনী মুস্তালেকের যুদ্ধে এক মুনাফিকের উক্তি কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে-

﴿يَقُولُونَ لئن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾

‘যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নীচদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিব।’ - মুনাফিকুন

এমনিভাবে মুনাফিকরা সাহাবীদের সাথে উপহাস করলে তাদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾

‘যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন (তাদের মন্দচারিতা সম্পর্কে) তাহলে তারা বলবে, আমরা তো শুধু মশকরা আর কথাচ্ছলে এসব বলেছি। আপনি তাদের বলুন, তেমাঁরা মহান আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছ?’ -তাওবা

আর মুনাফিকদের যুদ্ধের ময়দানে ধন-সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْكُم كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾

‘আপনি বলুন, তোমরা স্বেচ্ছায় খরচ কর বা বাধ্য হয়ে খরচ কর তোমাদের এ ব্যয় গ্রহণীয় হবে না কিছুতেই। কারণ, তোমরা ছিলে পাপাচার সম্প্রদায়। -তাওবা

মুনাফিকরা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল ও ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও কুরআনের ভাষায়-

﴿.....فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

‘জাহান্নামের অতলে নিষ্কিণ্ড হবে আর আপনি কখনো তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেন না।’ -নিসা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে পারি।

যেমন-

১. জিহাদের ময়দানে ভাল মানুষের পাশাপাশি মুনাফিক, পাপী, মতলববাজ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ অন্বেষীরাও উপস্থিত হতে পারে। রাসূল সা. এর সময় এসব লোকও জিহাদের ময়দানে অংশ নিত।

২. এ সকল মন্দ লোকের জিহাদে উপস্থিতি অন্যদের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের দলিল হতে পারে না, এ যুক্তিতে যে-দলে অপরাধি চক্রও রয়েছে। কারণ, রাসূল সা. এর সময়ও এসব শ্রেণীর লোকেরা ছিল। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়াসহ সামনে আসছে। (টীকা-বর্তমানে কেউ কেউ জিহাদি সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন কারণে টিপ্পনি কেটে থাকে। তারা বলে যে, কত সংগঠন দেখলাম! তারা সবাই আলেমদের সাথে বেআদবী করেছে। জিহাদের খাতে জমাকৃত সম্পদ আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অপবাদ লাগিয়ে নিজেরা জিহাদ হতে বিরত থাকতে চায়। তারা যে প্রশ্ন উত্থাপন করে, আসলে তা বাস্তব নয়। যদি বাস্তব হতোও তাহলেও কি এসব কারণে তাদের জন্য জিহাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার অনুমতি শরীয়তে থাকত পারে? )

৩. কোন ব্যক্তি জিহাদে অংশ নেয়া, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা তার ন্যায়নিষ্ঠতার প্রমাণ নয়। বিশেষত: যখন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে তার মন্দচারিতার পক্ষে। যেমনটা



আমরা ইতিপূর্বে দেখতে পেলাম যে, নানা মতলববাজ মানুষও জিহাদ করে, আল্লাহর রাহে ব্যয় করে।

আর যখন এসব কিছুই নবীযুগে রাসূলের জীবদ্দশায় হতে পেরেছে, তাহলে বর্তমানের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে?

অথচ রাসূল সা. বলে গেছেন,

«لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه حتى تلقوا ربكم»

‘যে যুগ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয় মনে হয় তার পরেরটা পূর্বের চে’ মন্দ হয়েই আবির্ভূত হয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত এ ধারা ক্রমশ চলতে থাকবে। -বুখারী

এসব আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসলমানরা যেন নিজেদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও দূষিত নিয়ত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সচেতন হয়। যার নিয়তে সামান্যতম খুঁতও দানা বাঁধে সে যেন অনতিবিলম্বে তা পরিশুদ্ধ করে নেয়। শয়তান যেন কোনভাবেই তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তার আমল, জিহাদ বরবাদ না করে বসে। কারণ, রাসূল সা. বলেছেন,

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

‘নিশ্চয় শয়তান বনী আদমের শিরায় শিরায় চলে।’ -বুখারী,

মুসলিম রাসূল সা. আরো বলেছেন,

ثم يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ

‘অতঃপর -কেয়ামত দিবসে- তারা তাদের নিয়ত অনুপাতেই উত্থিত হবে।’ -বুখারী, মুসলিম

হযরত আনাস রাযি. এর হাদীসটি একবার দেখুন, এতে নিয়ত সহীহ করার দিকনির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন,

وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يُلَبِّثْ إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.

কখনো কোন ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু ক্ষণিক তফাতেই ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও তদস্থীয় যাবতীয় বস্তুর চেয়ে প্রিয় বস্তু হিসেবে পরিণত হয়। -মুসলিম

সুতরাং নিয়ত পরিশুদ্ধ করার প্রতি যত্নবান হোন। যেন আপনার কর্মতৎপরতা ও জিহাদ উপকারী প্রমাণিত হয়।

কারণ, শরীয়ত জিহাদের প্রতিদানকে নিয়তের পরিশুদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যেমন, রাসূল সা. বলেন,

تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصَدِيقٌ بِرَسُولِي فَهُوَ عَلِي ضَامِنٌ أَنْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হল, একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য, তাঁর উপর অবিচল ঈমান এবং রাসূল সা. এর প্রতি অগাধ বিশ্বাসই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। মহান আল্লাহ তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন। হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (শহীদ হলে) অথবা নিজ বাসস্থানে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। আর সওয়াব ও গনীমত যা অর্জিত হওয়ার তা তো হলই। -মুসলিম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعْطَهُ اللَّهُ وَيُعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُخَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

‘বলে দিন, তোমরা মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা, প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। -আলে-ইমরান: ২৯-৩০

ভাই! নীচের আয়াতখানি একটু ভেবে দেখুন! আশা করি শত্রুর সাথে যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তা ও আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ নিয়তের ভূমিকা কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ -আল ফাত্হ: ২৯-৩০

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ অর্থাৎ, হৃদয়বিয়ার প্রান্তরে যে ‘বায়আত’ সজ্জাটিত হয়েছিল এ বায়আত পরিপালনে কারা আন্তরিক আর কারা ফেতনাবাজ এটা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। আর এ বায়আত আমরণ ধৈর্য ও অবিচলভাবে যুদ্ধ করে যাওয়ার উপর সংগঠিত হয়েছিল।

সুতরাং, যারা এ অঙ্গীকার পালনে আন্তরিক তাদের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ ঘোষণা করলেন,

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

(অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।) এখানে সাকিনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রণাঙ্গনে প্রশান্তি লাভ করা। এ থেকে বুঝা যায়, সাহাবাগণ যুদ্ধের ময়দান থেকে বিচলিত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। যার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ ‘তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।’

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সত্যবাদি ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের দুনিয়াতে এভাবে প্রতিদান দেন যে, তাদেরকে ইবাদত পরিপালনে সাহায্য করেন এবং সওয়াব ও গনীমতের ভাগী বানান। আর আখেরাতে তাদের প্রতিদান তো কল্পনার অতীত।

সত্যবাদীতার আরেকটি নিদর্শন হল- মানুষের প্রশংসা বা নিন্দাবাদ তাকে ইবাদত পালনে তার দৃঢ়তাকে টলাতে পারবে না। তদ্রূপ হাদিয়া, তোহফা কিংবা হুমকি-ধমকি তাকে আপন পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। সহযোদ্ধারা যদি জিহাদ ছেড়ে দেয় তবুও সে থাকে অটল অবিচল। সংখ্যা স্বল্পতায়ও সে অস্বস্তি বোধ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

‘আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত: কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।’ -আলে-ইমরান: ১৪৪

এখন যদি কারো সংকল্প-প্রতিজ্ঞা উল্লিখিত কোন কিছুর প্রভাবে নড়বড়ে হয়ে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে সে আল্লাহর জন্য নয়; বরং অন্য কারো জন্য কাজ করছে।

নিয়ত শুদ্ধ করার পাশাপাশি এ পথের পথিক একজন মুসলিমের এ বিশ্বাস ও আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় যে, জিহাদের পথে ছোট-বড় যে আমলই সে করুক- এটা অবশ্যই মহৎ কাজ। ইনশাআল্লাহ, এর প্রতিদান সে পাবে। চূড়ান্ত বিজয় সে অর্জন করুক চাই না করুক।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহ সা. এর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

-তাওবা: ১২০-১২১

সশস্ত্র প্রশিক্ষণের পর্যায়গুলোর কথাও এ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, জিহাদের প্রশিক্ষণও মূলত জিহাদ। এর জন্য ব্যয় মানে জিহাদে ব্যয়; এ জন্য পথ চলাও জিহাদ। এ দুয়ের মাঝে বিধানগত ফারাক নেই। কারণ আবশ্যকভাবেই তা কাফেরদের মর্মস্পীড়ার উদ্রেক করে। আর তাই তো জিহাদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি গ্রহণেও আমাদের জন্য কিতালের ন্যায় নামাজ, রোজার ন্যায় ইবাদত। এ অনুভূতি, উপলব্ধি জিহাদের প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক। কারণ, এও যে আল্লাহরই নির্দেশ পালন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾



‘আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার; নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। -আনফাল: ৬

### -জিহাদ সর্বোত্তম আমল-

জিহাদ ও জিহাদের প্রশিক্ষণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উত্তম আমল এবং যাবতীয় নফল ইবাদতের চে’ মর্যাদাবান। রাসূল সা. এরশাদ করেন,

«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان»

একদিন একরাত আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়াদারী করা মাসব্যাপী সিয়াম-কিয়ামের চে’ উত্তম। যদি এ অবস্থায় সে মারা যায় তাহলে তার আমলনামা অব্যাহত থাকবে, তার রিজিক অব্যাহত থাকবে। সর্বোপরি কবর-হাশর-মিজানের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। -মুসলিম

এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর কাছে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি মানুষের সমাজ থেকে আলাদা হয়ে নির্বাঞ্জিট ইবাদত করতে চাই আপনি যদি অনুমতি দেন! তখন রাসূল সা. তাকে বললেন,

«لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فَوَأَى نَاقَةَ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

‘না, তুমি এমনটা করো না’। আরে, আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের পদচারণা ঘরে থেকে সত্তর বছর এক নাগাড়ে নামাজ পড়ার চে’ উত্তম। তুমি কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করান? আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর! যে উটনীরদুধ দোহন-বিরতি পরিমাণ সময়ও কিতাল করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। - তিরমিযী শরীফ

অন্য বর্ণনায় আছে,

«قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله»

রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ আমল জিহাদের সমপর্যায়ের? তিনি বললেন, দেখ, সে আমল করার সামর্থ্য তোমাদের নেই। লোকেরা দুইবার বা তিনবার একই প্রশ্ন করল, আর প্রত্যেকবার তিনি বললেন, ‘সে আমল করার সামর্থ্য তোমাদের নেই।’ অতঃপর বললেন, যে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে তার দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তি যে অবিরত রোজা, নামাজ ও তিলাওয়াত করে; এমনকি মুজাহিদ ব্যক্তি ফিরে আসা পর্যন্ত ক্লাস্তহীনভাবে তাঁর ইবাদত পালন অব্যাহত থাকে। -বুখারী, মুসলিম

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, জিহাদ হজ্জ, ওমরা, এবং মসজিদে হারামে ইবাদত করার চে’ উত্তম আমল। অথচ, মসজিদে হারামে এক রাকাত পড়া অন্যসব মসজিদে হাজার রাকাত পড়ার সমান। তিনি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল স্বরূপ এ আয়াত উল্লেখ করেছেন,

﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾

‘তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। - তাওবা: ১৯-২১। মাজমুউল ফাতাওয়া: খ:২৮, পৃ:৫

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুজুল ও ব্যাখ্যাস্বরূপ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে সাহাবী নোমান বিন বাশীর রাযি. থেকে। তিনি বলেন, সাহাবারা যখন ‘সর্বোত্তম আমল কোনটি’ এ নিয়ে নানা কথা বলাবলি করছিল, তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘অনুরূপভাবে আমার জানামতে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, নফল ইবাদতের মধ্যেও জিহাদের সমপর্যায়ের কোন আমল নেই। কারণ, নফল হজ্জ, নফল রোজা ও নফল নামাজের চে’ জিহাদ পালনের সওয়াব অনেকে বেশি। এমনভাবে আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়াদারীর ফজিলত পবিত্র ভূমি- মক্কা,

মদীনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসে নিবাসী হওয়ার চে' বেশি। এমনকি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এ পর্যন্তও বলেছেন- আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারাদারী করা আমার কাছে কদর-রজনীতে 'হজরে আসওয়াদ' এর পাশে ইবাদতের চে' প্রিয়। আমি নির্দিধায় সর্বোত্তম রজনীতে সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে ইবাদতের চে' এক রাত স্বসস্ত্র পাহারাদারীকে অধিকার দিব।

আর রিবাতের এত ফজিলতের কারণেই নবী সা. ও সাহাবায়ে কেরাম মক্কা ছেড়ে মদীনায়ে বসবাস করেছেন। মদীনাকে আবাসভূমি বানানোর কারণ আরো হতে পারে, তবে এটিও অন্যতম কারণ ছিল যে, রাসূল সা. ও সাহাবারা মদীনায়ে রিবাতের আমলে রত ছিলেন। আর রিবাত বলা হয় এমন স্থানে অবস্থান করা যা শত্রুদের ত্রস্ত করে রাখে। তদ্রূপ নিজেরাও আতংকিত থাকে।

সুতরাং যে এমন বিপদসংকুল স্থানে শত্রুদের দমন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করল সে-ই 'মুরাবিত' তথা দীনের প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। আর সকল কাজে তো নিয়তই মূল বিষয়। রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিন রিবাতে কাটানো অন্য যে কোন জায়গায় হাজার দিন কাটানোর চে' উত্তম। হাদীসটি সুনানের কিতাবসমূহে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফে হযরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিন এক রাত রিবাতের সওয়াব মাস ব্যাপী রোজা ও নামাজে কাটানোর চে' বেশি। যে রিবাতরত অবস্থায় মারা যাবে, জান্নাতে তার আমল এবং রিজিক অব্যাহতভাবে জারি থাকবে এবং সে সব রকম ফেৎনা (মুনকার-নাকীরের সওয়াল ইত্যাদি) থেকে নিরাপদ থাকবে। এতো হল রিবাতের ফজীলত। তাহলে জিহাদের ফজীলত কত বেশি তা বলাই বাহুল্য।-মাজমুউল ফাতাওয়া: খ:২৮, পৃ:৪১৮

আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. বলেন, 'আবু-আব্দুল্লাহ- আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, ফরজ বিধানসমূহের পর জিহাদের চে' উত্তম আমল আমি আর খুঁজে পাই না।

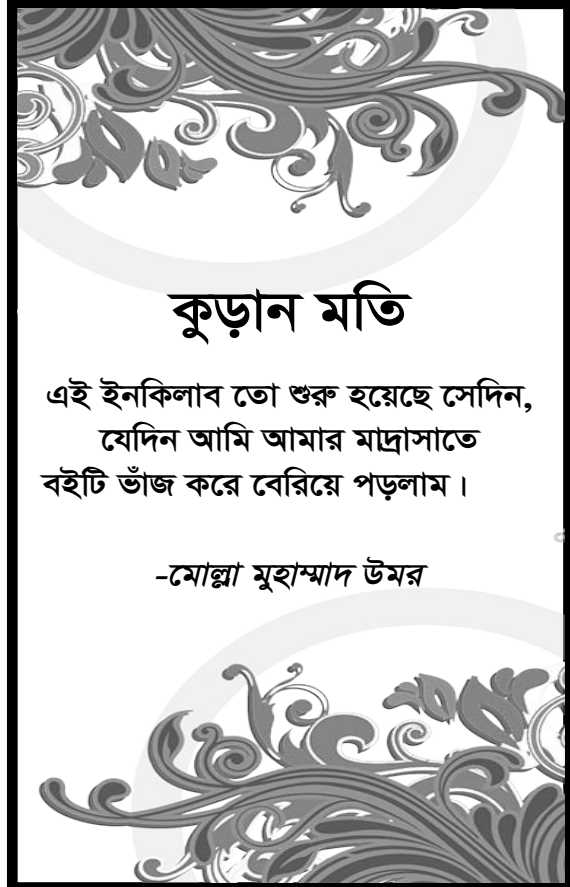
এ মাসআলাটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে তার একদল বিশিষ্ট শাগরিদ বর্ণনা করেছেন। যেমন- আছরাম রহ. বলেন, ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার চে' উত্তম কোন আমল রয়েছে এটা আমার জানা নেই।

ফযল বিন যিয়াদ রহ. বর্ণনা করেন, আমি আবু-আব্দুল্লাহ (আহমদ বিন হাম্বল) কে বলতে শুনেছি -যখন তাঁর সামনে জিহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল তখন তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন- 'এর চে' উত্তম আমল অন্যটি নেই।' অন্য এক শাগরিদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, 'শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার মত উত্তম আমল আর নেই।'

আর সরাসরি কিতালে শরীক হওয়া তো সর্বোত্তম ইবাদত। কারণ, যারা শত্রুদের সাথে কিতাল করে তারাই তো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও ইসলামের নীতির পক্ষে প্রতিরোধ করেন। সুতরাং এরচে' উত্তম ইবাদত আর কোনটি হবে? অন্যরা নিরাপদে জীবন কাটান, আর মুজাহিদগণ সর্বদা আতংকে থাকেন। প্রাণভ্রমরটিও উৎসর্গ করেন।

তাছাড়া, জিহাদ হল ধন-মান ব্যয় করার নাম। আর এর উপকারিতা সকল মুসলমান ভোগ করেন। ছোট-বড় সবল-দুর্বল নারী-পুরুষ সকলে। এ ছাড়া অন্য সব আমলের উপকারিতা কিংবা ঝুঁকি কোন দিক বিবেচনায় তার সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং কীভাবে অন্যান্য আমল জিহাদের সমমানের হবে? -মুগনী ওয়া শরহুল কাবীর: খ:১০, পৃ:৩৬৮-৬৯

আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত, ইনশাআল্লাহ।







-ড. শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

## নারী, বৃদ্ধ ও শিশু হত্যার হুকুম

ইসলাম শুধুমাত্র যোদ্ধাদেরকেই হত্যার নির্দেশ দেয়, অথবা যারা ইসলামের শত্রু কাফের-মুশরিকদের অর্থ, পরামর্শ অথবা অন্য কোন মাধ্যমে সহযোগিতা করে তাদেরকেও হত্যার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

‘যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আর সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।’  
বাকারা-১৯০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেৎনা (শিরক, কুফর ইত্যাদি অধর্ম) দূর হয় আর দীন (এবাদত) সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আনফাল-৩৯

উভয় আয়াতে ক্রিয়াটি অর্থগতভাবে উভয়দিকের যুদ্ধক্ষেত্র এবং তদসম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজে অংশদারিত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং যে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, আর যে অন্য কোনভাবে যুদ্ধের সহযোগিতা করল উভয়কেই হত্যা করা হবে।

আর যদি কেউ এমনটি না করে তাহলে তাকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং যদি কোন মহিলা সরাসরি অথবা অন্য কোনভাবেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না।

শিশু ও ধর্মজায়কদেরও হত্যা করা হবে না। তবে তারা যদি মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে বা তার সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে অন্য কথা। কারণ, আমরা মুশরিক যোদ্ধাদের বেছে বেছে হত্যা করতে সক্ষম নই।

শিশু ও নারীদের হত্যা মানব জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। আগত প্রজন্মের প্রবৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অশ্রু ও রক্ত দিয়ে ইতিহাস রচিত হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য। আর এটা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম তো চায় মানুষ ইসলামকে ভালবাসুক। আর আল্লাহ, রাসূল ও তাঁর দীন মানুষের কাছে সমাদৃত হোক। তবে ইসলাম এটা পছন্দকরে না যে, মানুষের মত আনুযায়ী ইসলাম চলবে বা তাদের সম্ভ্রষ্ট অনুপাতে বিধান আরোপিত হবে। কারণ, তাদের ইচ্ছার উপর ইসলামকে ছেড়ে দেওয়া হলে আসমান জমিন এবং তাতে যা কিছু আছে তার জন্য তার ধ্বংস ডেকে আনবে। এজন্য পৃথিবীর বুকে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে গিয়ে যদি অপারগ হয়ে নারী শিশুদের হত্যা করার মত পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসে তাহলে যথসাধ্য তাদেরকে উদ্দেশ্য না করে বরং কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে আক্রমণ করা হবে। তাতে যদি কিছু নারী-শিশু নিহত হয় তা আল্লাহর বিধানের জন্য মেনে নিতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾

সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। মুমিনুন-৭১

বৃদ্ধ, নারী ও শিশু হত্যার ব্যপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. মালিকীগণ ও ইমাম আওয়ালী রহ. বলেন, নারী ও শিশু হত্যা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কাফিররা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলেও তাদের দিকে তির নিক্ষেপ জায়েয নেই। যদি কোন দুর্গে তাদের পরিবার ও শিশুরা সংরক্ষিত থাকে তাহলে মিনজানীক ও অন্য কিছু দিয়ে তার উপর আক্রমণ করা জায়েয নেই।

২. হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব: যদি নারী ও শিশু হত্যা ব্যতীত কোন বিকল্প না থাকে, যেমন তারা কাফিরদের সাথে মিশে আছে, অথবা কাফিররা তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তাহলে তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু না বানিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ আছে। এতে যদি তারা নিহত হয় তাহলে তাতে অবৈধতার কিছু নেই।

মাওয়ারদী রহ. বলেন, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে নারী ও শিশু হত্যা জায়েয নেই। কারণ রাসূল সা. তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারাও যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয আছে। - আহকামে সুলতানিয়া: ১৪

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন, নারী ও শিশু যদি দুর্গের মধ্যে থাকে তাহলে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলাতেও কোন সমস্যা নেই। এমনকি তার মধ্যে যদি কোন মুসলিম বন্দি থাকে তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। তবে আক্রমণের সময় কাফেররাই লক্ষ্যবস্তু থাকবে।

বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধদের হত্যা করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ সা. আবু আমের আশআরী রাযি. কর্তৃক দুরাইব ইবনে ছম্মাহকে হত্যার অনুমোদন করেছেন। তখন তার বয়স ছিল একশর ও উপরে।

অন্ধ, পঙ্গু, পাগল, বন্দিদের হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা মুসলমানরা তো শুধু তাদেরকেই হত্যা করবে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে। কাফের যোদ্ধাদের শহর পানি দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের উপর মিনজানিকদিয়ে গোলা নিক্ষেপ করা জায়েয, এতে কোন সমস্যা নেই। যদি তার মধ্যে নারী ও শিশু এবং মুসলিম বন্দিও থাকে। .... তারা যদি মুসলিম শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তবুও তাদের উপর আক্রমণ করা জায়েয। তবে কাফেররাই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু থাকবে’ -আল মাবসূত ১৩/০১

ইমাম আবু দাউদ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. একটি বর্ণনায় নারীদে হত্যা নিষেধের কারণ এভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, কোন এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলার লাশ পাওয়া গেল। তখন রাসূল সা. বললেন, এ নারী তো যুদ্ধের জন্য আসেনি। (তাকে হত্যা করা হল কেন?)

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস। ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ .

রাসূল সা. পরিচালিত এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলার লাশ পাওয়া গেল পরে রাসূল সা. নারী ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেন। -বুখারী: ৭/৫৬৫

অন্য দিকে শাফেয়ীগণ তাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন, এই হাদীসটি আম ( عام ) সুতরাং অন্য হাদীসের মাধ্যমে এটা খাস ( خاص ) হবে। এর ব্যাপক হুকুম সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যেমন ছ'ব ইবনে জাহামা রাযি. এর হাদীস। রাসূল সা. কে মুশরিকদের ঘরের লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যাদের উপর রাতে আক্রমণ করা হবে। আর এতে তাদের পরিবার পরিজনও আক্রান্ত হবে। তখন রাসূল সা. বললেন, هم منهم তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। নাসায়ী ব্যতীত সকল মুহাদ্দিসীনগণ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. এই হাদীসের সাথে আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেছেন,

وقال الزهري: ثم نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء و الولدان

যুহরী রহ. বলেন, অতঃপর রাসূল সা. নারী ও শিশু হত্যা নিষেধ করেছেন। যারা নারী ও শিশু হত্যা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করে থাকেন, তারা এই হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিষয়টি যেমনই থাকুকনা কেন তারা যদিও যুহরী রহ. এর কথাকে নাসেখ (অন্য বিধান বাতিলকারী) মনে করেন, তবে হানাফী ও শাফেয়ী ইমামগণের মতটিই গ্রহণযোগ্য। তাদের দীল হল ইমাম তিরমিযী রহ. এর বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস এবং আবুদাউদ ও আহমাদ রহ. এর হাদীস।

তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেন,

نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف

‘রাসূল সা. তায়েফ বাসীদের মোকাবেলায় মিনজানিক স্থাপন করে ছিলেন’

সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. বলেন,

بيننا هوازن مع أبي بكر الصديق و كان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم

‘আমরা আবু বকর রাযি. এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের উপর রাতে আক্রমণ করলাম। তাকে রাসূল সা. আমাদের আমীর বানিয়ে ছিলেন।

আর তায়েফ এবং হাওয়াযেনের যুদ্ধ রাসূল সা. এর হায়াতের শেষ দিকে হয়ে ছিল। এ হিসেবে এই হাদীসটি অন্য হাদীসের চেয়ে প্রাধান্য পাবে।

যারা বলেছেন ‘মুশরিকরা তাদের নারী ও শিশুদের সাথে মিশে থাকা অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা নাজায়েয’ এ কথার অর্থ দাড়ায় কাফেরদের সাথে আমাদের আর কোন যুদ্ধ হতে না দেওয়া। এটা মুসলমানদের জন্য খুবই আশংকাজনক এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। বিশেষ করে যখন দুই দলের মাঝে দূরপাল্লার আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ চলতে থাকে। অর্থাৎ কামান, ট্যাংক, মিসাইল, ক্ষেপণাস্ত্র, বোমারু বিমান ইত্যাদির মাধ্যমে। তখন যুদ্ধ করার অনুমতি না থাকার মানে হল তোমরা ধ্বংস হও, তোমাদের দীন ধ্বংস হোক তবুও কাফেরদের নারী-শিশুদের হত্যা করা যাবে না।

তাছাড়া যখন সকল ফকীহগণ একথার উপর একমত হয়েছেন যে, কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং মুসলমানদের হত্যা করা ব্যতীত কোন বিকল্পও না থাকবে তখন কাফেরদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথমে মুসলমানদেরকে হত্যা করা জায়েয। তারা আবার যখন নারী-শিশুরা কাফেরদের সাথে মিলে থাকবে তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিবেন না তা কিভাবে সম্ভব? যদি তারা অনুমতি না দেয় তাহলে তো মুশরিকদের নারী-শিশুদের রক্ত মুসলমানদের রক্তের চেয়েও সম্মানিত ও মূল্যবান হয়ে গেল। এটা কেমন কথা?



তবে যে নারীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করে না, সৈন্যবাহিনীর সাথেও সংযুক্ত থাকে না এবং কাফেরদের কোন সহায়তাও করে না তাকে হত্যা করা হবে না। ... তবে বর্তমান কালের অবস্থা অনেক ভয়াবহ। দেখা যায় যে যেখানে পুরুষ আছে সেখানে নারীর অবতরণ অবশ্যই পাওয়া যায়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, কাফেররা যদি কিছু মুসলমানকে ঢাল বানায় এবং এ সকল কাফেররা মুসলমানদের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়, তাহলে মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল না বানিয়ে শুধু কাফেরদের উদ্দেশ্য করে তীর নিক্ষেপ জায়েয। আর যদি মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি না হয় তাহলেও কোন কোন আলেমের মতে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা জায়েয। -মাজমুউল ফাতোয়া ৭৩৫/৮২

শাফী মাযহাবে নারী, শিশু হত্যা এবং বৃদ্ধ, পাদ্রী ও অন্ধ হত্যার মাঝে পার্থক্য করা হয় এবং তারা প্রয়োজন ব্যতীত নারী ও শিশু হত্যা হারাম মনে করেন।

রমালী রহ. বলেন, নারী (যদিও সে কিতাবী না হয়) শিশু, পাগল, হিজড়া যদি আল্লাহ অথবা তাঁর কোন রাসূলকে গালি না দেয় তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। -আর রামালী ৪৬/৮

বৃদ্ধ ও পাদ্রীর ব্যাপারে রমালী রহ. বলেন, পাদ্রী, খাদেম, বৃদ্ধ ও অন্ধদের হত্যা করা জায়েয যদিও তারা যুদ্ধে শরীক না হয় এবং বাহ্যিক ভাবে যুদ্ধে কোন সহযোগিতা না করে। কারণ আল্লাহ তাআলা সকল মুশরিকদের ব্যাপারে বলেন, **اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ** মুশরিকদের হত্যা কর। তবে অন্য এক মত অনুযায়ী তাদের হত্যা করা জায়েয নাই। -আর রামালী ৪৬/৮

বৃদ্ধ, অসুস্থ, অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের হত্যার বিধান এদের হত্যার ব্যাপারে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়। ১. হানাফী এবং মালেকী মাযহাবের ইমামগণ বৃদ্ধদের নারী ও শিশুর হুকুমে মনে করেন। তাঁরা তাদের স্বপক্ষে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করেন,

**لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلا صغيرا**

‘তোমরা অতি বৃদ্ধ এবং ছোট শিশুকে হত্যা করো না। (ফকীহগণ বলেন, শিশু হত্যা না করার ইল্লাত (কারণ) এবং বৃদ্ধ হত্যা না করার ইল্লাত (কারণ) একই আর তাহল- তাদের মাধ্যমে কাফেরদের কোন উপকার হয় না এবং মুসলমানদেরও কোন ক্ষতি হয় না।) ইবনে নুজাইম রহ. বলেন, নারী, শিশু, অতি বৃদ্ধ, অন্ধ ও পঙ্গুদের হত্যা করা হবে না, তবে তাদের কেউ যদি পরামর্শ দিয়ে কাফেরদের সাহায্য করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। বাহরর রায়েক

শাফী মাযহাবের ইমামগণ তাদের হত্যা বৈধ মনে করেন। তারা তাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে থাকেন উল্লিখিত আবু আমের আশআরী কতুক দুরাইব ইবনে ছাম্মাহকে হত্যার হাদীসটি দিয়ে। দুরাইবের বয়স তখন একশরও বেশী ছিল। তারা তাদের স্বপক্ষে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করেন-

عن سمره: اقتلوا شيوخ المشركين و استحيوا شرهم.

‘তোমরা মুশরিকদের বৃদ্ধদের হত্যা কর তাদের শিশুদের নয়।’ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী। ইমামতিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. রাসূল সা. কর্তৃক বৃদ্ধদের হত্যার আদেশের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাদের ঈমান না আনার সম্ভবনা বেশী, আর শিশুরা ঈমান আনার খুবই নিকটবর্তী। তাছাড়া বয়স্করা যুদ্ধের ক্ষেত্রে কৌশলগত অনেক পরামর্শ দিয়ে থাকে। যেমন দুরাইব ইবনে ছাম্মাহ মালিক ইবনে আউফকে নসিহত করেছিলেন, সে যেন তার পরিবার এবং স্ত্রীকে রেখে যায়। কিন্তু সে এই নসিহত প্রত্যাখ্যান করেছিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর দুরাইব এই কবিতা অবৃতি করে-

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشيد إلا ضحى الغد  
فلما عصوني كنت منهم وقد أري غوايتهم وأنى غير مهتد  
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

‘আমি তাদের সঠিক পথে চলতে বলেছি, কিন্তু তারা সুপথে চলেনি। তবে পরের দিন তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

তারা যখন আমার অব্যাহত হয়েছে আমি তাদের সাথেই ছিলাম। আমি তাদের ভ্রষ্টতা দেখেছি এবং আমি নিজেও সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারিনি।

তারা যখন আমার অব্যাহত হয়েছে তখন আমি তাদের সাথে ছিলাম। তারা যদি বিপথে যায় আমিও বিপথে যাবো, আর তারা যদি সঠিক পথে চলে আমিও সঠিক পথে চলবো।

তাদের হত্যার স্বপক্ষের আরেকটি দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী,

**فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم**

তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।’ উক্ত আয়াতের ব্যাপকতা। অর্থাৎ **المشركين** (মুশরিক) শব্দটি আম (ব্যাপক) এবং তার শুরুতে **ال** (আলিফ ও লাম) **استغراق** (ইস্তিগরাক) ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য এসেছে। অতএব এখান থেকে বৃদ্ধদের আলাদা করতে হলে অন্য আর একটি সহীহ দলীল লাগবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

ইবনে মুনিযির রহ. বলেন, ‘এমন কোন দলীল আমার জানা নেই যার মাধ্যমে আয়াতের ব্যাপকতা থেকে বৃদ্ধদের আলাদা করা যায়। কেননা, সে কাফের, তার জীবিত থাকায় কোন ফায়দা নেই।’ সুতরাং যুবকদের যেভাবে হত্যা করা হয় তাকেও সেভাবে হত্যা করা হবে।

বিষয়টির সারসংক্ষেপ, যাকে আমরা প্রাধান্য দিব: যার মাধ্যমে মুশরিকদের সামান্য পরিমাণও উপকার হবে, সে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পাদ্রী বা পঙ্গু যেই হোক না কেন তাকে হত্যা করা হবে। আর যার মাধ্যমে মুশরিকদের কোন উপকার হবে না এবং মুসলমানদেরও কোন ক্ষতি হবে না তাকে হত্যা করা হবে না। - নাইলুল আওতার ২৪৮/৭

আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. কে অসিয়ত করে বলেছেন, কখনই নারী, শিশু, এবং অতি বৃদ্ধদের হত্যা করবে না। -মুওয়াত্তায়ে মালেক

মাবসূত নামক কিতাবে সারাখসী রহ. উল্লেখ করেন, ‘আবু উইসুফ রহ. বলেন, আমি আবু হানীফা রহ. কে নারী, শিশু, এবং অতি বৃদ্ধ, যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি তা মাকরুহে তাহরীমী বলেছেন। -মাবসূত ৭৩১/০১

চলবে.....

.....সুতরাং, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই। তখন, যখন তোমার পক্ষে ইচ্ছাপূরণ করা সম্ভব। মানুষের মন কিছুতেই ভরে না। তাই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সুযোগ দেওয়ার অর্থ হলো- এক আকর্ষণ তৃষ্ণার্ত লোকের সমুদ্র থেকে পানি পানের মতো। সে যতো বেশি পানি পান করে, ততোই তার পিপাসা বাড়তে থাকে। কারণ সমুদ্রের নোনা জলে এই পিপাসা কখনোই মেটার নয়। রোমানদের দেখো, তারা সবরকম খাবার আর মিষ্টি খেতো। কোনোটা বাদ দিতো না। একসময় এমন অবস্থা হলো যে, তাদের খাবারের রুচিই চলে গেলো। তখন তারা উপবাস থাকতে শুরু করলো, যাতে আবার খাবারে রুচি ফিরে পায়! তেমনি ভাবে, তারা যৌনমিলনেও এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়লো যে, একটা সময়ে নারী দেখলেই তাদের ঘেন্না হতে লাগলো! তখন তারা শহর ছেড়ে দূর-দূরান্তে চলে যেতো। এরপর নারীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ফিরে এলে শহরে ফিরে আসতো। পশ্চিমাৱা তো এখন যৌনতাকে এতো সম্ভা করে ফেলেছে যে, খাদ্য, পানীয়, অস্ত্রিজেনের মতো ‘যৌনতা’ও এখন সর্বত্র বিরাজমান! কিন্তু ফলস্বরূপ কী দেখা যাচ্ছে? অগণিত ধর্ষণের কাহিনী। যৌনতার কারণে ছড়িয়ে পড়া নানান রকম রোগ, ইত্যাদি। এর কারণ হলো, মানুষের খায়েশ কখনো মেটে না। আকাঙ্ক্ষার কোন শেষ নেই। সাধ-আহ্লাদকে যেই না একটু খানি জায়গা দেবে, তারা আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

তোমার আত্মাকে তুমি যতই দিতে থাকবে, তোমার আত্মার চাওয়া বাড়তেই থাকবে। আর যখন একে দমিয়ে রাখা হবে, তখন সে অল্পেই খুশি থাকবে।

জাবের রাযি. একদিন বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। ওমার রাযি. তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় যাচ্ছে জাবের?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমার খুব গোশত খেতে ইচ্ছা করছে, তাই গোশত কিনতে যাচ্ছিলাম।’ ওমার বললেন, ‘হে জাবের! যখনই তোমার কোন কিছু পেতে ইচ্ছা করে, তুমি কি সেটা কিনে ফেলবে?’

একদিন ওমার রাযি. এর সামনে কিছু খাবার রাখা হলো, আর তিনি তা দেখে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনি কেন কাঁদছেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন?’ (সে সময় তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন।) তিনি বললেন, ‘আমার ভয় হচ্ছে যে কেয়ামতের দিনে আমাকে বলা হবে,

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾

অর্থ: যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিবজীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে। -সূরা আহকাফ: আয়াত ২০

সুতরাং, প্রবৃত্তিকে দমন করা এবং দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসিতা-আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা দুনিয়াবি শখ-আহ্লাদকে পা দিয়ে পিষে ফেলার আগে মানুষের চারিত্রিক নৈতিকতা উন্নত হতে পারে না। যে আত্মা ইতোমধ্যে তার খাহেশাতের কাছে, তার সাধ-আহ্লাদের কাছে বন্দী হয়ে গেছে, সে কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে না। তাই, তুমি যদি আল্লাহর রাহে চলতে চাও, নিজেকে থামাও!

দুঃখজনক হলেও সত্যি, এসব জ্ঞান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না। চরিত্র গঠনের শিক্ষা, আদব-কায়দা এসব এখন আর শেখানো হয় না। এগুলো শেখানোর আলেমরাই আমাদের মাঝে নেই। এমনকি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও এগুলো শেখানো হয় না। কোন শরীয়াহ কলেজে যাও- এগুলো পাবে না। আদব আখলাকের শিক্ষা, আত্মাকে গড়ে তোলার শিক্ষা, নফসের পবিত্রকরণের শিক্ষা- এসব কোথাও নেই।

তুমি দেখবে, আজকাল অনেকে আছে যারা কতো কিছু মুখস্থ করে ফেলেছে, মাশাআল্লাহ। হয়তো অনেক বই আর হাদীসের গ্রন্থ পড়েছে। রিয়াদুস সলেহীন, রাওয়াদুন নযীর, নাইলুল আওতার, সুবুলুস সালাম। ফাতহুল বারি, সব তার পড়া। কিন্তু সে কখনো নফল রোজা রাখে না, কিয়ামুল লাইলে দাঁড়ায় না! আরাম-আয়েশের একটি সুযোগকেও সে হাতছাড়া করে না। তাই এতোকিছু সত্ত্বেও, তার অন্তর আসলে মৃত। কারণ, তার অন্তর অসুস্থ। সে নিজের (মনের) যত্ন নেয়নি। সে নিজের সাধ-আহ্লাদের লাগামকে টেনে ধরেনি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি!

-আত-তারবিয়াতুল জিহাদিয়াহ ওয়াল বিনা- ১/৩৬৭-৩৬৮





# হেফযাতি ও মাফলাহাতি যখন প্রিয় নবীর নির্দেশনার পরিপন্থি

মুফতী রশীদ আহমদ লুথিয়ানবী রহ.

যখনই শরীয়তের কোন বিধান এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ উপস্থিত হয়েছে তখনই রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সব ধরনের কৌশল ও কল্যাণের দোহাই পরিত্যাগ করেছেন। তার কিছু উদাহরণ আমরা হাদীসের পাতা থেকে তুলে ধরব:

**১. হযরত যায়েদ রাযি. যখন তার স্ত্রী যয়নব রাযি. কে তালাক দিয়ে দিলেন তখন রাসূল সা.তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বিবাহ না করার মধ্যে অনেক বড় একটি ভাল দিক বিবেচনায় আসল যে, যদি বিবাহ করেন তাহলে মানুষ নিন্দার ঝড় তুলবে যে, এ কেমন নবী নিজের পুত্র বধুকে বিবাহ করেছে। এমনকি এ আশংকাও আছে, যারা নতুন মুসলমান তারা নাকি আবার ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যারা ঈমান আনত তারা ঈমান না আনে। এতে তো ইসলামের অগ্রগতি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। এই দিকটি বিবেচনা করলে বিবাহ না করার মধ্যেই ছিল সাম্যক কল্যাণ। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ জারি হল যে, ‘আমার আদেশের সামনে নিজেদের কল্লিত সব কল্যাণ ভাবনা পরিহার করতে হবে এবং বিবাহ করতে হবে। তাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করুক আর না করুক বা আল্লাহ না করুক কেউ ইসলাম থেকে ফিরেও যাক না কেন? আল্লাহর আদেশ, এ বিয়ে করতেই হবে। এ আদেশের ফলে, বিবাহ না করার মধ্যে বাহ্যত যে কল্যাণ দেখা যাচ্ছিল তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। এখানে এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা চাই যে, আল্লাহর রাসূল সা. এর এ বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ফরজ, ওয়াজিব কিছুই নয়; বরং শুধু জায়েযের পর্যায়ে ছিল। তা স্বত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশটি এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যেমন কোন ফরজের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট করা এবং ঘোষণা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কোন ধরনের কল্যাণের দোহাই আল্লাহর নির্দেশের সামনে কোন মূল্যই রাখে না। কল্যাণের দিক বিবেচনা করে আল্লাহর কোন হুকুমকে পারিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। মাদ্রাসার ধারক বাহক এবং তাবলীগওয়ালাদের জন্য এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যিক যে, তারা নিজস্ব শৃঙ্খলা এবং নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক ছোট ছোট কল্যাণের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কতগুলো আদেশ অমান্য করে চলছে? যারা চক্ষুস্মান এবং আল্লাহওয়ালারা তারা তো এ কথা বলেন যে, দলিলের সামনে সব ধরনের মাসালেহকে মসলার মত পিষে দাও। কারণ মসলা যত বেশি পিষবে তরকারী তত বেশিই মজাদার হবে।**

**২. রাসূল সা. কুরাইশ সরদারদের নিয়ে মজলিস করছিলেন। তখন এক অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা শুরু করলেন। কুরাইশরা এতে বিরক্ত ভাব দেখাল। রাসূল সা.ও ভাবলেন এরাতো আমার আপন। এদের জন্য কোন কিছু জানারতো আরো অনেক সময় আছে। এখন কুরাইশ সরদারদের বুঝানোর একটা মোক্ষম সুযোগ। হতে পারে তারা ঈমান আনবে। এতে ইসলামের অনেক উন্নতি হবে; কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম হল, যাদের মধ্যে দীনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা থাকে তাদেরকে যাদের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নেই তাদের চেয়ে গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা এটা অপছন্দ করলেন। এমনকি একটি সূরাও নাযিল করে সতর্ক করলেন। ভাবনার বিষয় হল, এত কঠোরভাবে এ সাবধানবানী কেন অবতীর্ণ করলেন? কারণ, এটাই যে, আল্লাহর হুকুমের সামনে কোন কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছিল। এ ঘটনা থেকেও দীনের কাজে নিয়োজিত লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই যে, আল্লাহর নির্দেশের সামনে যখন একজন নবীকে পর্যন্ত কল্যাণের দোহাই দেওয়ার কারণে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হল। আজ যারা অতি সাধারণ কোন কল্যাণের বিবেচনায় আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রকাশ্য অমান্য করে চলছে তারা আখেরাতের আযাব থেকে নিস্তার পাওয়া এবং আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথেই থাকার আশা কীভাবে করতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলেন,**

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تَطْغِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۖ﴾

‘আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।’ -কাহফ: ২৯ এখানে আল্লাহ তাআলা রাসূল সা. কে এ নির্দেশনা দিতে চাচ্ছেন যে, মক্কার সরদারদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুস্থ মুসলমানদেরকে আপনার নিকট হতে তাড়িয়ে দিবেন না। তারা যদি গরীব মুসলমানদের সাথে একত্রে বসে দীনের কথা শুনতে চায় তাহলে শুনবে নতুবা তারা আপন অবস্থায় থাকুক।

৩. বাইয়াতের রেজওয়ানের ঘটনা: রাসূল সা. এর কাছে যখন হযরত ওসমান রাযি. এর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল রাসূল সা. অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। বললেন, যতক্ষণ না আমি তাদের থেকে এর প্রতিশোধ নিচ্ছি এ স্থান আমি ত্যাগ করব না। অতঃপর একটি গাছের নিচে বসে এ কথার উপর বাইয়াত নেওয়া শুরু করলেন যে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে প্রাণ থাকবে কাফেরদের সাথে লড়াই করে যাব। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করব না।’ .... কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জান। আমি তাদের সাথে লড়াই অভ্যাহত রাখব আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত। ... কুরাইশরা যখন এই বাইয়াতের সংবাদ পেল আতঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং সন্ধি করার জন্য প্রস্ততি নিতে লাগল। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং রাসূল সা. ও তার সাহাবাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে রাসূল সা. এর এই পদক্ষেপ কল্যাণকামিতার বিপরীত ছিল। কারণ, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান রাযি. এর জন্য চৌদ্দ শত সাহাবী, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, ওমরের মত ব্যক্তিত্বও বিদ্যমান ছিলেন এমন কি স্বয়ং রাসূল সা. ও ছিলেন; তাদের সবার শহীদ হয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে? অথচ তাদের উপরই নির্ভর করে আছে দীনের ভবিষ্যত অগ্রগতি। তাছাড়া সাধারণ বিবেচনাতে এটাই ছিল যে, তারা পরাজয় বরণ করবে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে অনেক দূরে ছিলেন তাদের সাথে শুধু তলোয়ার ব্যতীত আর কোন অস্ত্রও ছিল না। বিপরীতে ছিল আরবের পূর্ণ জনবল। কিন্তু যখন আল্লাহর ফরমান এসে গেল এ সব দিক বিবেচনার অযোগ্য রেখে আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। আর এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের মদদ করলেন এবং কাফেরদের মনে তাদের ভয় ঢুকিয়ে দিলেন।

৪. মুতার যুদ্ধের ঘটনা: এখানে রাসূল সা. একজন মাত্র সাহাবী হারেস ইবনে ওমায়ের রাযি. এর রক্তের প্রতিশোধের জন্য তিন হাজার সাহাবীর ছোট একটি জামাত দুই লক্ষ স্বশস্ত্র রোমীয় বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বাহিনী পাঠানোর পূর্বেই রাসূল সা. ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তিন জন বড় বড় সাহাবী যাবেদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবী তালেব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি. শহীদ হয়ে যাবেন। তবুও তাদেরকে উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করলেন এবং বিজয় দান করলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সাধারণ দৃষ্টিতে রাসূল সা. এর এ পদক্ষেপ অবিবেচক মনে হতে পারে। কিন্তু রাসূল সা. যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করলেন। আল্লাহ তাদের সাহায্য করলেন।

৫, আবু বকর রাযি. এর হযরত উসামার বাহিনী প্রেরণের ঘটনা: রাসূল সা. এর ইন্তেকালের পরপরই এরতেদাদ তথা দ্বীন ত্যাগের ফেতনা মাথাচারা দিয়ে উঠল। তাই অবস্থার নাজুকতার কারণে অনেক সাহাবী এমনকি হযরত ওমর রাযি.ও এই পরামর্শ দিলেন যে, কিছুদিনের জন্য উসামার বাহিনী প্রেরণ মূলতবী করা হোক। তখন আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন, রাসূল সা. যে বাহিনী গঠন করে দিয়ে গেছেন আমি তার মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারব না। এমনকি পাখিরা যদি আমাদেরকে ছোঁ মারে আর হিংস্র প্রাণি মদীনাকে ঘিরে ফেলে কিংবা কুকুরগুলো যদি উন্মুল মুমিনীনদের পায়ে কামড়ও দেয় তবুও আমি উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করব।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কোন এক আনসার ব্যক্তি ওমর রাযি. কে বললেন আপনি আবু বকরকে বলুন, তিনি যেন আমাদের আমির উসামা ব্যতীত অন্য কাউকে বানিয়ে দেন। ওমর রাযি. আবু বকর রাযি. কে তা বললেন। তখন আবু বকর রাযি. ওমর রাযি. এর দাড়ি ধরে বললেন, হে খাতাবের বেটা তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুন! আমি এমন কাকে আমীর নিযুক্ত করব রাসূল সা. যাকে আমীর নিযুক্ত করেন নি?

এ ঘটনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত আবু বকর রাযি. সমস্ত যুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর হুকুমের সামনে বিলীন করে দিয়েছেন এবং দীনের হেফাযতকে দীনের মারকাজ (মদীনা) এর হেফাযতের উপর প্রধান্য দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের সাহায্য করলেন এবং কাফেরদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দিলেন। ফলে দীনেরও সংরক্ষণ হল এবং দীনের মারকাজেরও সংরক্ষণ হল।

**কুড়ানো মতি**

“মৃত্যুতো মাত্র একবারই আসে,  
সুতরাং, তা যেন হয়  
আল্লাহরই পথে”

**শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.**



আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَمْثَلًا﴾

‘আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যেন আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ আর কারা ধৈর্যশীল এবং তোমাদের অবস্থাদিও যাচাই করতে পারি।’ -মুহাম্মদ: ৩১

শায়েখ সা‘দী রহ. ‘وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ’ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ, আমি তোমাদের ঈমান ও সবার পরীক্ষা করব। ‘حَتَّىٰ نَعْلَمَ’ সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে এবং আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করবে তাঁর দীনের সাহায্যার্থে, তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে সে-ই প্রকৃত মুমিন। আর যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে গড়িমসি করবে, নিষ্ক্রিয় থাকবে এটা তার ঈমানের দুর্বলতার কারণেই হবে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যার আছে তিনিও খুব স্পষ্ট করেই বলতে পারবেন -বর্তমানে সবচে’ কঠিন ও বিপজ্জনক ইবাদত হল জিহাদ। কারণ, ইসলামের শত্রুরা এ উম্মাহর উপর আজ হায়েনার মত বাঁপিয়ে পড়েছে। ঘন্য সব পন্থায় ষড়যন্ত্র করে চলেছে। নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র নিয়ে তারা উম্মাহর সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। উদ্দেশ্য- মুসলমানদের আপন ধর্ম-বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্ত করা। লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের সহায়তাকারী; অবশ্যই তিনি উত্তম সহায়তাকারী।

আর তাই বর্তমানে একজন মুসলিমের জীবনের সবচে’ কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করতে চায় তা হবে- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ইবাদতের সিদ্ধান্ত নেয়া।

যখন কেউ জিহাদে বের হওয়ার চিন্তা করে, জীন ও মানব শয়তানরা জোটবদ্ধ হয়ে তাকে ফুসলাতে থাকে, তার সামনে নানা অজুহাত, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে- যেন সে এ মহৎ সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটে।

সুতরাং এটিকে একটি মৌলনীতি হিসেবে ধরে নিতে পারেন যে, যখন কোন একটি ইবাদত পালনে শয়তানী কুমন্ত্রণা নানা উপায়ে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করবে; বুঝে নিবেন- নিশ্চয় এ ইবাদতটি আল্লাহর নিকট মহামূল্যবান। আর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি, শয়তানী কুমন্ত্রণা সবচে’ বেশি স্বক্রিয় হয় জিহাদের পথে অগ্রসরমাণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই। শয়তান তার সামনে নানা রকমের সংশয়-সন্দেহ ও গুরুত্বহীন বিষয়ের অবতারণা করে জটিলভাবে, যা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করেনি। অবশেষে তাকে সেপথ থেকে বিচ্যুত করেই সে ক্ষান্ত হয়।

এ ক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি নিজেকে প্রশ্ন করতো- যখন নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করি তখনও কি এমন সংশয়-সন্দেহ জাগে? - না, জাগে না।

আরো অশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, যে সকল আলেম আপনাকে জিহাদে বের হতে বারণ করে তাদের কাছে যদি জাগতিক বিদ্যা কিংবা ব্যবসা বানিজ্য করার অনুমতি চান, তাহলে কিন্তু তাঁরা সানন্দেই সম্মতি জ্ঞাপন করবে। সুবহানাল্লাহ!!

মনে গেঁথে রাখুন যে, ইহুদী খ্রিস্টান ও তাদের মিত্ররা সবচে’ সম্ভ্রান্ত হয়, উম্মাহর জিহাদের কথা শুনলে। আপনি জিহাদ ব্যতীত অন্য ইবাদত যত বেশি, যত খুশি পালন করুন- দিনে রোজা রাখুন, রাত জেগে নামাজ পড়ুন, কুরআন পাঠ করুন, আরো কিছু করুন তারা এতে মাথা ঘামাবে না; কিন্তু যেইনা আপনি জিহাদের কথা বলবেন, উম্মাহকে এর প্রতি আত্মহীন করবেন তারা আপনার উপর দারুণভাবে চটে যাবে। আল্লাহর শত্রুরা সব এক হয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়াবে, সভা-সেমিনার করবে। হুমকি-ধমকি ছাড়াবে, শক্তির ভয় দেখাবে। কেন? আপনাকে নিস্তরঙ্গ করার জন্য। এ সত্য ও বাস্তবতা কোন বুদ্ধিমান অস্বীকার করতে পারবে না। আপনি দীনের খেদমত করতে চান? করুন! দুই হাতে লিখুন ইসলামের কথা। মনভরে বলুন। সভা-সেমিনার, মিছিল-মিটিং সব রাস্তা আপনার জন্য উন্মুক্ত। দীন প্রচারের জন্য যত খুশি সম্পদ জমা করুন। তারা কিছুমাত্র মাথা ঘামাবে না। তবে সাবধান! জিহাদের কথা যেন ঘূনাক্ষরেও আপনার মুখ ফস্কে না বেরোয়! এর পক্ষে বলা, চাঁদা তোলা, এর অর্থ কী জানেন? প্রাণনাশ, নির্বাসন, দুর্নাম আর মধ্যযুগীয় নির্যাতন-নিপীড়ন। সুতরাং এ পথে যাবেন তো মরবেন!!

অথচ দেখুন, আলেমগণ এ সম্পর্কে কী বলে গেছেন- ‘যে ইবাদত পরিত্যক্ত করে রাখা হয় তা পালনে যে সচেষ্টিত হয় আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক বেশি।’

শায়েখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, কুরআন ও হাদীসের সিংহভাগ আলোচনা নামাজ ও জিহাদ সম্পর্কেই বিবৃত হয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, জিহাদের গুরুত্ব ও মহত্ব অনেক বেশি। এ জন্যই বলি, ‘বর্তমানে জিহাদের চেয়ে কঠিন ইবাদত আরেকটি নেই।’

আর তাই অনেককে দেখবেন, অগাধ এলেম অর্জন করেছে, ইবাদতেও পিছিয়ে নেই কিন্তু; জিহাদের বেলায় আর তার উদ্যমতা লক্ষ করা যায় না; বরং সে ক্ষেত্রে শুধু বাহানা আর অক্ষমতা প্রকাশ করে নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে। লা-হাওলা..... জিহাদের পথে যাত্রাকে দুই পর্বে ভাগ করা যায়।

১. পর্ব - কষ্টময়। ২. পর্ব - শান্তিময়। যখন মুজাহিদ জিহাদের পথে যাত্রা করার কথা চিন্তা করে তখন থেকে শুরু হয় কষ্টের পর্ব। কারণ, তখন তাঁর মাথায় প্রশ্ন জাগে- সে কি পারবে ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি, চাকুরি-বাকরি, ধন-সম্পদ সব কিছু ছেড়ে যেতে? পারবে কি নিজের স্বাদ আহ্লাদকে কুরবান করতে? এ যে চিরদিনের তরে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রশ্ন? এসব বাঁধা পেরিয়ে যখন সে রণাঙ্গনের পিছিল পথে কদম বাড়ায় এবং চূড়ান্তভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এভাবে এক সময় যখন তার প্রাণবায়ু পৃথিবীকে বিদায় জানায় তখনই শুরু হয় জিহাদের ২য় পর্ব তথা অনাবিল শান্তিময় যাত্রা। এ যাত্রা শুরু হয় স্বর্গীয় প্রশান্তির আবেশে। সে মরে তবে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করে না। কবরস্থ হয় কিন্তু কবরের মুসিবতের সম্মুখীন হয় না। আযাব তো দূরের কথা। কেয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি কী জিনিস সে টেরও পায় না। মহানিনাদ তার কেশাধ্রুও স্পর্শ করে না। এ স্বর্গীয় যাত্রার শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে অনাবিল অফুরন্ত নিবাসভূমি জান্নাত লাভের মধ্য দিয়ে; রবের সম্ভ্রান্তি আর দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে। সুতরাং এ যে শান্তিময় যাত্রা তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। হে আল্লাহ! আপনার মহান অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে আমাদের আরজ- আপনি আমাদের জীবন-সমাপ্তি শাহাদাতের মাধ্যমে করুন। জান্নাতের সুউচ্চ মহলে আমাদের নিবাস দিন। আপনি তো করুণার আঁধার, পরম দয়ালু, অনুপম দাতা! আমীন!



# রমজান: রহমাত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস

ড. সামী আল উরাইদী হাফিজাছল্লাহ

হে আল্লাহ! আপনার লাখোটি শুকরিয়া যে, আপনি আমাদের হায়াতকে লম্বা করে রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি যে, এই জিহাদের ময়দানেও আপনি আমাদের জীবনকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার নিকট রমজান মাস বরকত ও ফজীলতের মাস। তিনি এই মাসকে অধিক প্রতিদান ও নৈকট্যের মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন। সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সুনাত হল তিনি সৃষ্টি মাখলুকের একজনকে আর একজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং মর্যাদা ও মানের দিক থেকে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ফেরেস্তা সৃষ্টি করে একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদাবান বানিয়েছেন। স্থান সৃষ্টি করে এক স্থানকে অন্য স্থানের চেয়ে বেশী বরকতময় বানিয়েছেন। অনুরূপ সময় সৃষ্টি করেও এক সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটাই সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সুনাত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

‘আপনার প্রভু যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন আর যা ইচ্ছা নির্বাচিত করেন।’

আল্লাহ তাআলা রমজান মাসকে শ্রেষ্ঠ ও বরকতময় মাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কেননা, তিনি এই মাসে রেখেছেন তাঁর আনুগত্য প্রকাশ ও নৈকট্য অর্জনের বিশেষ কিছু মুহূর্ত। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হল এই মাসকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ করে বেশি বেশি নেক আমল ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা। ইমাম তাবারী রহ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন,

افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فان لله نفحات من رحمة يصيب بها من يشاء من عباده.

তোমরা সারা বছর কল্যাণকর কাজ কর এবং আল্লাহর রহমত অর্জনের বিশেষ মুহূর্তগুলো তালাশ কর। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত অর্জনের বিশেষ কিছু মুহূর্ত রয়েছে। আর তিনি যাকে চান সেই শুধু তা খুঁজে পায়।

রমজান মাসকে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই রহমত, মাগফেরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির সময় বানিয়েছেন। বিষয়টি এমন নয় যেমন লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ‘তার শুরুর অংশ রহমতের, মধ্যমাংশ মাগফেরাতের এবং শেষাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির।’ এটি একটি দুর্বল হাদীস। এবং ওহীর বর্ণনাও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, রমজানের শুরু-শেষ পুরোটাই রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। রমজান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতের মাস।

শরীয়তের বিভিন্ন বর্ণনা এদিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা এই মাসকে তাকওয়া অর্জনের পথ বানিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যে রূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।-বাকারা: ১৮৩

রমজান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতের মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এ মাসে শয়তানকে আটকে রাখা হয়। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন,

قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم.

‘তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত হয়েছে। এটা বরকতময় মাস। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এর রোযাকে ফরজ করেছেন। এতে জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। এ মাসে এমন একটা রাত আছে যা এক হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল।

রমজান মাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতের মাস। এ আয়াত থেকেও তা অনুভূত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾

‘নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’-আহযাব: ৩৫

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোযা রাখে তার পূর্বের সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের রাতগুলো ইবাদতে কাটাতে তারও পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাত ইবাদতে কাটাতে তারও পূর্বকৃত সমুদয় গুনাহ মাফ করা হবে।’

রাসূলুল্লাহ সা. একদিন মিসরে উঠলেন। তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠার সময় বললেন, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠার সময় বললেন, আমীন। এবং তৃতীয় সিঁড়িতে উঠার সময়ও বললেন, আমীন। অতঃপর তিনি বললেন,

أتاني جبريل و قال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين و من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين و من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقلت آمين.

আমার নিকট জিবরাঈল আ. এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমজান পেল কিন্তু তার গুনাহ মাফ করা হলনা আল্লাহ তাআলা তাকে দূরে ঠেলে দিন (তাকে ধ্বংস করুন)। তখন আমি বললাম, আমীন। যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে পেল অথবা তাদের কোন একজনকে পেল তা সত্ত্বেও সে জাহান্নামে গেল (অর্থাৎ তাদের খেদমত করে নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না) আল্লাহ তাকে দূরে ঠেলে দিন (তাকে ধ্বংস করুন)। তখন আমি বললাম, আমীন। যার সামনে আপনার (নাম) আলোচনা করা হয় কিন্তু সে আপনার উপর দরুদ পড়ে না আল্লাহ তাকে দূরে ঠেলে দিন (তাকে ধ্বংস করুন)। তখন আমি বললাম, আমীন।

প্রিয় ভাই! রমজান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং দোআ কবুলের মাস। রমজানের প্রত্যেক দিনে এবং প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলা অনেক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহর রাসূল সা. বলেন,

ان لله عتقاء في كل يوم و ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة.

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক রাতে অনেককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে দেন। তাদের থেকে প্রত্যেক বান্দার দোয়া কবুল করা হয়।’ রাসূল সা. বলেন,

ان لله عند كل فطر عتقاء

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ইফতারের সময় অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। রমজানের প্রত্যেক দিন এবং রাতেই দোয়া কবুল এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। রমজান মাস আনুগত্য প্রকাশ এবং নৈকট্য অর্জনের মাস। ভাগ্যবান তো সে-ই যে এই মাসকে পুরোপুরি কাজে লাগায়। হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন সৌভাগ্যবান সে যে নৈকট্য অর্জনের মোক্ষম সুযোগগুলো কাজে লাগায় এবং ঐ সময়ের ফরজ ও নফল ইবাদত আদায় করে তার মাওলার নৈকট্য অর্জন করে। তাই প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর দেওয়া রহমত অর্জনের সময় প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত অর্জন করা। আল্লাহ তাওফিক দান করুন! আমীন।

# রমজান ও আকাবেরে উম্মাহ

-সালাহউদ্দীন

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনরা!

السلام عليكم ورحمة الله - অনেক আগ্রহ ও ভালবাসা নিয়ে আপনাদের কাছে এই পত্রটি প্রেরণ করছি। আমি অন্তর থেকে শুধু আল্লাহর জন্যই আপনাদের ভালবেসে এই পত্রটি প্রেরণ করছি। মহান রাক্বুল আলামীনের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদের সকলকে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে একত্র হওয়ার তাওফিক দান করেন। রমজানের আগমন উপলক্ষে আপনাদের সামনে নসিহতের এই বিনম্র হাদিয়াটুকু পেশ করছি। আশা করি আপনারা প্রশস্ত হৃদয়ে এটা গ্রহণ করবেন এবং আমাকেও দোআর হাদিয়া বিনিময় করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাদের সকলকে হেফাজত করুন। প্রিয় ভাই ! আমরা কীভাবে পবিত্র রমজান মাসকে স্বাগতম জানাবো? আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

‘আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিহিত। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সংপথে আসতে পারে।’ -বাকারা: ১৮৬

প্রিয় ভাই!

মহান আল্লাহ তাআলা রমজান মাসকে অন্যান্য মাস অপেক্ষা অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন। তা হতে নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

১. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধীয়।
২. ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেস্তারা সালেহীনদের জন্য মাগফেরাতের দোআ করতে থাকেন।
৩. আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন জান্নাতকে সুসজ্জিত করে বলেন, ‘অচিরেই আমার নেক বান্দারারোযা রেখে খাদ্য না খেয়ে কষ্টভোগ করে তোমার নিকট পৌছবে।’
৪. শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।
৫. এতে কদরের রাত্রি আছে। যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হল সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল।
৬. রমজানের শেষ রাত্রিতে রোযা দারদের মাফ করে দেওয়া হয়।
৭. রমজানের প্রত্যেক রাতেই অনেক বান্দাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

আমার ভাই! যে মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য এত তাকে আমরা কী দিয়ে স্বাগত জানাতে পারি? আমরা কি তাকে খেল তামাশায় মত্ত হয়ে, দীর্ঘ রাত জেগে গল্প-গুজব করে স্বাগত জানাব, না এ মাসের আগমনে বিব্রত হবো (নাউযুবিল্লাহ) এবং আমাদের উপর বিরাট এক বোঝা মনে করবো? না আমরা তাকে সেভাবে স্বাগত জানবো যে ভাবে আল্লাহর নেক বান্দারা স্বাগত জানিয়েছেন, আন্তরিক তওবা ও নেক আমলের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে, তার প্রতিটি সময়কে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করে, তা নেক আমল ও সং কাজের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করার ওয়াদা দিয়ে এবং আল্লাহ তাআর নিকট তাঁর ‘হুসনে ইবাদাতের’ উপর তাওফিক চেয়ে।

প্রিয় ভাই! তোমার সামনে রমজানের নির্ধারিত কিছু আমল পেশ করছি। তুমি সেগুলো যত্নসহকারে আমল করার চেষ্টা করবে।

**১. সাওম:** হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ الصَّيَّامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَخَذَكَ صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.

অর্থ: আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হতে সাতশগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোযা একমাত্র আমারই জন্য (রাখা হয়) আর আমিই এর প্রতিদান দেব। বান্দা আমারই জন্যে তার প্রবৃত্তি, পানাহার পরিহার করে থাকে। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে একটি তার ইফতারের সময়, অপরটি (পরকালে) তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের সুগন্ধি হতেও অধিক সুগন্ধময়। রোযা হল ঢাল স্বরূপ; সুতরাং যখন তোমাদের কারও রোযার দিন আসে, সে অনশ্রীল কথাবর্তা বলবে না এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হবে না। তাকে যদি কেউ কটু কথা বলে অথবা তার সাথে তর্কে জড়াতে চায় তাকে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। - বুখারী, মুসলিম।



রাসূল সা. আরও বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের রোযা রাখল তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ মনে রাখতে হবে শুধু পানাহার ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমেই এই বিপুল সওয়াবের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشُرْبَهُ.

‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করেনি আল্লাহ তাআলার নিকট তার পানাহার ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই (তার পানাহার ছেড়ে দেওয়া আল্লাহর কাছে কোন কাজে আসবে না)।’ -বুখারী

রাসূল স. বলেন,

الصوم جنة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل أني أمرؤ صائم.

রোযা হল ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অন্যায় কাজ না করে এবং মূর্থতাপূর্ণ আচরণ না করে। তাকে যদি কেউ কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় তখন সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। -বুখারী

সুতরাং হে ভাই! তুমি যখন রোযা রাখ তোমার সাথে যেন তোমার হাত, কান, চক্ষু, জবান এবং শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই রোযা রাখে। তোমার রোযা যেন নিছক পানাহার থেকে বিরত থাকা না হয়।

**২. কিয়ামুল লাইল:** রাসূল স. বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছওয়াবের আশায় রমজানের রাতগুলো ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। -বুখারী,

মুসলিম আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.﴾

‘এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি বিনাশকারী।’

রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবাগণ রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতেন। এটা তাদের নিত্য দিনের অভ্যাস ছিল। আয়েশা রাযি. বলেন, ‘তোমরা রাত্রি জাগরণ ছেড়ে দিওনা। কেননা রাসূল সা. সর্বদাই রাত্রি জাগরণ করেছেন। অসুস্থতা কিংবা দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতে না পারলে বসে বসে ইবাদত করতেন।’ ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. দীর্ঘরাত পর্যন্ত নামাজ পড়তেন এবং মধ্য রাতে পরিবারের অন্যান্য লোকদের নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, الصلاة الصلاة ‘নামাজ পড়, নামাজ পড়’ এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, ﴿كَيْ نَسْبَحَكَ كَثِيرًا﴾

‘যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি।’ এবং এই আয়াত পড়তেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

‘বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।’

ওসমান ইবনে আফফান রাযি. রাতে অধিক পরিমাণে নামাজ পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আমীরুল মুমিনীন এবং ওসমান ইবনে আফফান রাযি. রাতে অধিক পরিমাণে নামাজ পড়তেন এবং কখনও কখনও এক রাকাতে পুরো কুরআন খতম করতেন।

আলকামা ইবনে কায়েস রহ. বলেন, আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর সাথে রাত্রিযাপন করলাম। তিনি রাতের প্রথমভাগে নামাজে দাঁড়ালেন এবং এলাকার মসজিদের ইমামের মত কোন তাড়াহুড়া ব্যতীত ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। তার আশপাশের লোকেরা তার তেলাওয়াত শুনছিল। অতঃপর রাতের অন্ধকার দূর হতে এতটুকু অবশিষ্ট রইল, যে সময়ে মাগরিবের আজান সহ নামাজ পড়া যায়- তখন তিনি নামাজ শেষ করলেন। তারপর বিতির পড়লেন।

সাইদ ইবনে য়ায়েদ বলেন, যে কারী আমাদের কিয়ামুল লাইল পড়াতেন দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করতেন। দীর্ঘ কিয়ামের কারণে আমরা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতাম কিন্তু আমাদের কেউই ফজরের আগ পর্যন্ত নামাজ ছেড়ে চলে যেতেন না।

সতর্কবাণী:- প্রিয় ভাই! তুমি সব সময় ইমামের সাথে তারাবী পড়বে, যাতে তোমার আমলনামায় সারা রাত ইবাদত করার সওয়াব লেখা হয়। রাসূল সা. বলেন,

من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.

‘যে ব্যক্তি ইমামের সাথে অবস্থান করে (নামাজ পড়ে) যতক্ষণ না তিনি নামায শেষ করে ফিরে যান, তার আমলনামায় এক রাত ইবাদত করার সওয়াব লেখা হয়।’ -আবু দাউদ

**৩। সদকাহ:** রাসূল সা. ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বপেক্ষা বেশি দানশীল। তিনি সবচেয়ে বেশি দান করতেন রমজান মাসে। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ

রমজান মাসের সাদাকাহ সর্বোত্তম সদকাহ। -তিরমিযী

য়ায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ‘আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে এমন সময় সাদাকাহ করতে বললেন যখন আমার অনেক সম্পদ ছিল। মনে মনে বললাম, যদি দানের ক্ষেত্রে আজ আবু বকর রাযি.কে আমি অতিক্রম করতে না পারি তাহলে আর



সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه و عتقه رقبته من النار و كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء.

‘যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাতে তার গুনাহ মাফ করা হবে এবং সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। তার জন্য রয়েছে রোযাদারের অনুরূপ ছাওয়াব। আর তার সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমাদের সকলের তো রোযাদারকে ইফতার করানোর মত সক্ষমতা নেই? তখন রাসূল সা. বললেন,

يعطى الله هذا الثواب لمن فطر صائماً علي مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء، ومن سقي صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً بعدها حتي يدخل الجنة.

আল্লাহ তাআলা এই প্রতিদান ঐ ব্যক্তিকে দিবেন, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানিমিশ্রিত দুধ অথবা খেজুর ভিজানো পানি অথবা এক ঢোক পানি পান করিয়ে ইফতার করাবে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানি পান করালো আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউজ (হাউজে কাউসার) থেকে পানি পান করাবেন। এরপর জান্নতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার আর পিপাসা লাগবে না।

৪. কুরআন তেলাওয়াত: এখানে আমরা রমজানে সালাফদের দুটি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব-

ক. অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত।

খ. কুরআন তেলাওয়াত অথবা শ্রবণের সময় কাঁদা।

ক. অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত: রমজান মাস কুরআন নাযিলের মাস। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান বান্দা বান্দীর উচিত এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। আমাদের সালাফদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, রমজান আসলে অন্য সব কাজ ছেড়ে আল্লাহর কিতাবের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী হতেন। রমজান মাসে জিবরাঈল আ. ও রাসূল সা. কুরআন দাওর করতেন। ওসমান রাযি. প্রত্যেক দিন একবার করে কুরআন খতম করতেন। আমাদের সালাফদের মধ্য থেকে অনেকেই কিয়ামুল লাইলে প্রত্যেক তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। কেউ সাত দিনে আবার কেউ দশ দিনে কুরআন খতম করতেন। তারা নামাজে এবং নামাজের বাইরে কুরআন পড়তেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. রমজানে নামাজের বাইরে ৬০ বার কুরআন খতম করতেন। কাতাদা রাযি. স্বাভাবিকভাবে প্রতি সাত দিনে একবার এবং রমজান মাসে প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। আর রমজানের শেষ দশদিনে প্রতি রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন। ইমাম জুহরী রহ. রমজানে হাদীস পাঠ ছেড়ে এবং আহলে ইলমের মজলিস ত্যাগ করে কুরআন পাঠে মনোযোগী হতেন। সুফিয়ান সাওরী রহ. রমজান মাসে সমস্ত ইবাদত ছেড়ে কুরআন তেলাওয়াতে মনোযোগী হতেন।

ইবনে রজব রহ. বলেন, স্বাভাবিকভাবে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা নিষেধ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনে অথবা বিশেষ কোন স্থানে যেমন- মক্কা মুকাররামা ইত্যাদিতে

এলাকার অধিবাসী নয় এমন লোকদের জন্য বেশি বেশি কুরআন খতম করা মুস্তাহাব। আর এটা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক রহ. সহ অন্যদের মত। সালাফদের আমলও এদিকে ইঙ্গিত বহন করে।

খ. তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা:- সালাফে সালাহীনগণ চিন্তাফিকির করে বুঝে বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মন্ত্র পড়ার মত দ্রুত কুরআন পড়তেন না। তাদের অন্তরে রেখাপাত করত। তারা এর মাধ্যমে প্রভাবিত হতেন।

বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন, اقرأ علي আমাকে কুরআন পড়ে শুন। আমি বললাম, আমি আপনাকে পড়ে শুনাবো! অথচ আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়। তিনি বললেন, إني أحب أن اسمعه من غيري অন্যের থেকে কুরআন শ্রবণ করতে আমার ইচ্ছা করছে। তিনি বলেন, ‘অতঃপর আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত শুরু করলাম, এবং إنا جئنا من آياتك পর্যন্ত তেলাওয়াত করলাম। তখন রাসূল সা. এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার দু’ চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝড়ছে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যখন-

﴿وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. أَفَإِنْ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجَبُونَ﴾

এই আয়াত নাযিল হল তখন সাফার অধিবাসীরা এতো কাঁদতে লাগল যে, তাদের গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাসূল সা. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্না দেখে আমরাও আর কান্না ধরে রাখতে পারলাম না। রাসূল সা. বলেন,

لا يلج النار من بكى من خشية الله

‘আল্লাহর ভয়ে যে ক্রন্দন করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

ইবনে ওমর রাযি. একবার সূরা ‘মুতাফফিফীন’ পড়া শুরু করলেন এবং يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ‘যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে।’ পর্যন্ত পৌছলেন, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন। আর সামনে পড়তে পারলেন না। মুজাহিদ ইবনে যুফার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘একবার সুফিয়ান সাওরী আমাদেরকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। কেরাত শুরুর পর তিনি যখন إناك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - পর্যন্ত পৌছলেন তখন কাঁদা শুরু করলেন এবং এতো কাঁদলেন যে, আর সামনে পড়তে পারলেন না। অতঃপর আবার الْحَمْدُ لِلَّهِ থেকে শুরু করলেন ইবরাহীম ইবনে আশআব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফুজাইলকে আমি বলতে শুনেছি, ‘কোন এক রাতে তিনি সূরা মুহাম্মদ পড়তে শুরু করলেন এবং

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ  
এই আয়াত বারবার পড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদের অবস্থা খতিয়ে দেখেন তাহলে তো আমাদের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। হে আল্লাহ আপনি আমাদের গোপন বিষয় খতিয়ে দেখলে নিশ্চিত আমরা ধ্বংস হবো। আমরা জাহান্নামে যাবো আর কাঁদতে লাগলেন।

৫. সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা: রাসূল সা. ফজরের নামাজ পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বস্থানে বসে থাকতেন। -মুসলিম



আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة.

‘যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ল অতপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করল এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ল। তার একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব হবে -তিরমিযি।

(এই প্রতিদান তো স্বাভাবিক সব সময়ের জন্য তাহলে রমজান মাসে কত বেশি পরিমাণে প্রতিদান পাওয়া যাবে?!)

হে ভাই! তুমি এই অসংখ্য সওয়াব অর্জনের জন্য বুজুর্গাণে দীনের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার কর এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে মনবল অটুট রাখ। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং তাঁর পথে চলার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

৬. এতেকাফ: রাসূল সা. প্রত্যেক বছর রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। তাঁর ওফাতের বছর বিশ দিন এতেকাফ করেছেন। -বুখারী এতেকাফ এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে অনেক ইবাদত করার সুযোগ তৈরী হয়। যেমন, তিলাওয়াত, নামাজ, দোআ, জিকির ইত্যাদি।

৭. রমজান মাসে ওমরা করা: রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন, ‘عمره في رمضان تعدل حجة’ রমজান মাসে ওমরা করা হজ্জ করার মত।’ অন্য রেওয়াজে এসেছে ‘আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়।

সুতরাং হে বন্ধু! রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হজ্জ করার জন্য তোমাকে স্বাগতম!

৮. লায়লাতুল কুদর তালাশ করা: আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

রাসূল সা. বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  
‘যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান ও সওয়াবের আশায় ইবাদত করবে আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। -বুখারী, মুসলিম

রাসূল সা. নিজে কদরের রাত তালাশ করতেন এবং তাঁর সাহাবাদেরকেও তা তালাশ করার আদেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কদরের রাত পাওয়ার আশায় রমজানের শেষ দশ রাত জাহিরত রাখতেন।

মুসনাদে আহমদে উবাদা রাযি. থেকে মারফু সনদে বর্ণিত আছে,

مَنْ قَامَهَا إِبْتِغَاءَهَا ثُمَّ وَقَعَتْ لَهُ غُفْرٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.

‘যে ব্যক্তি কদরের খোঁজে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে এবং তা পায়। তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ - মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী

কোন কোন সাহাবী ও তাবেরীদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা গোসল করে খুশরু মেখে রমজানের শেষ দশ রাত লাইলাতুল কদর খোঁজ করতেন।

হে ভাই! তুমি তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করো না। বিশেষ করে যদি তা হয় কদরের রাতের মত সময়। বরং তুমি কদরের রাতে তোমার হারিয়ে যাওয়া সময়গুলোর তালাফী কর। কেননা কদর একটা জীবন। আর তাতে ইবাদত বন্দেগী করা এক হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ অর্জন থেকে বঞ্চিত হল সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল।

আর কদরের রাত রমজানের শেষ দশ রাতের কোন এক রাত। আবার শেষ দশ রাতের মধ্যে বেজোড় রাত। আর এ রাত্রিটি সাভাশের রাত্রি হওয়ার বেশি সম্ভাবনা। যেমনটি উবাই ইবনে কা’ব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها و هي ليلة سبع و عشرين .

আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই জানি কদরের রাত কোন রাত? আর সেটা ঐ রাত যে রাতে রাসূল সা. আমাদের ইবাদত করতে আদেশ দিয়েছেন। আর তা হল সাভাশের রাত।’

তিনি আরো বলেন, ঐ রাত চেনার কিছু আলামত আছে, যে সকল আলামত সম্পর্কে রাসূল সা. আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। সে দিন সকালে সূর্য উঠবে কিন্তু সূর্যের আলো থাকবে না।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত বর্ণিত তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি যদি কদরের রাত পাই তাহলে আমি কী প্রার্থনা করব? রাসূল সা. বলেন,

قولي اللهم إني أعفو تحب العفو فاعف عني.

‘হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।’ -তিরমিযী, আমহদ

৯. বেশি বেশি দোআ, জিকির ও এস্তেগফার করা। হে ভাই! রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। রমজানের দিনরাত শ্রেষ্ঠ দিনরাত এবং রমজানের প্রতিটি সময় শ্রেষ্ঠ সময়। সুতরাং তুমি বেশি বেশি দোআ, জিকির ও এস্তেগফারের মাধ্যমে এর প্রতিটি সময় কাজে লাগাও। বিশেষ করে এ মাসের দোআ কবুলের সময়গুলো কাজে লাগাতে হবে।

রমজানে দোআ কবুলের সময়সমূহ:

১. ইফতারের সময়- ইফতারের সময় রোযাদারের দোআ বিফলে যায় না। ২. শেষ রাত্রি- যখন আল্লাহ পাক প্রথম আসমানে এসে বান্দাদের আহ্বান করে বলেন,

"هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له."

‘আছে কি কেন প্রার্থী? আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করবো।

৩. শেষ রাতে এন্তেগফার করা- আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

অর্থ: 'রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।'

সতর্ক বাণী: প্রিয় ভাই দীর্ঘ আলোচনার পর তোমাকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করবো। তুমি কি জান সেটা কি? তা হল ইখলাস। হ্যাঁ, ইখলাস। কত রোযাদার আছে ক্ষুদার্ত ও পিপাষার্ত থাকা ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপকার হয় না। কত লোক তাহাজ্জুদ পড়ে কিন্তু জাখত থাকা ও ক্লাস্ত হওয়া ব্যতীত তার আর কোন ফায়দা হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাকে এ বিষয় থেকে মুক্ত রাখুন।

নবী কারীম সা. এ বিষয়টি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا - ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায়। আমাদের সালাফে সালাহীনগণ নিজেদের উপর আত্মতৃপ্ত না হয়ে তাদের আমল গোপনে সম্পন্ন করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। এই তো আমরা এক মহান তাবেরী আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. কে দেখতে পাই যে, তার সম্পর্কে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেন, হাদীস পড়াতে গিয়ে কখনো কখনো তার হৃদয় কোমল হয়ে পানি চলে আসত। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে নাক পরিস্কার করার ভান করতেন এবং বলতেন এতো ঠাণ্ডা লেগেছে! অথচ তিনি এর মাধ্যমে তাঁর কান্না লুকাতে চাইতেন। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'অনেক মহান পুরুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যাদের মধ্যে একজন এমন ছিলেন যিনি তার স্ত্রীর সাথে এক বালিশে ঘুমাতে এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার মাথার নিচের বালিশ ভিজে যেত কিন্তু তার স্ত্রী তার কান্নার কথা জানতেন না। আর একজন এমন ছিলেন যে, কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার গালের উপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরতো কিন্তু তার পাশের লোক বলতে পারতো না যে সে কাঁদছে।

আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. সারা রাত লুকিয়ে লুকিয়ে নামাজ পড়তেন আর সকাল বেলা এমন ভাবে আওয়াজ করতেন যে, তিনি এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। ইবনে আবী আদী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দাউদ ইবনে আবী হিন্দ চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোযা রেখেছেন কিন্তু তার পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত জানতো না যে, তিনি রোযা রেখেছেন। তিনি মুচির কাজ করতেন। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তার পরিবারের লোকদের থেকে খাবার নিয়ে বের হতেন। পথে এসে মানুষকে খাবার সদকা করে দিতেন এবং বিকেলে বাসায় ফিরে পরিবারের সাথে ইফতার করতেন।

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমার নিকট এমন এক বান্দার সংবাদ পৌছেছে, যে গোপনে ইবাদত করতো। অতঃপর শয়তান তার পিছু নিল এবং তাকে পরাজিত করে তার কাছে প্রকাশ্যে ইবাদত করাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিল। এর পরও শয়তান তার পিছু ছাড়ল না; বরং তার কাছে লোকদের প্রশংসাকে প্রিয় করে তুলল। সুতরাং সে প্রকাশ্যে ইবাদত করা থেকে অহংকারে গিয়ে স্থির হল।

### বর্জনীয়:

প্রিয় ভাই! আমি আলোচনা অনেক দীর্ঘ করে ফেললাম এবং তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম। কিন্তু এর মাধ্যমে আমি তোমাকে সময় কাজে লাগানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছি। আমি তোমাকে আর একটু বিরক্ত করবো। তুমি কি আমাকে

অনুমতি দিবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি বিষয়ে সতর্ক করবো? বিশেষ করে রমজান মাসে সেটা আরো ভয়াবহ আরো বিপজ্জনক। আর তা হল- সময় নষ্ট করা এবং আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করা। আরও একটি হল অলসতা করে আল্লাহর রহমত ও ইলাহী-উপহার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا - وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ - وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾

এবং যে আমার স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুস্খান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, যেমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। তার পরকালের শাস্তি কঠরতার এবং চিরস্থায়ী।

প্রিয় ভাই! তোমার অন্তরে কি এটা একটুও দাগকাটে না এবং তোমার কি একটুও কষ্ট লাগেনা যে, এই মুবারক বরকতপূর্ণ রমজানের রত্রে স্টেডিয়ামগুলো মুসলিম যুবক যুবতীদের দিয়ে পরিপূর্ণ। এবং এই মুবারক রমজানের রাতে মহান আল্লাহ তাআলার কত নাফরমানি এবং তাঁর অবাধ্যতাপূর্ণ কাজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, আজ মুসলমানরাই মুসলমানের সময়ের উপর আক্রমণ করে তাদের সময় নষ্ট করছে এবং তাদের ফুলের মত সুন্দর যুবকদের সময় নষ্ট করতে বাধ্য করছে। কিন্তু তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তোমার ভাইকে দীনের পথে ডাক এবং তার জন্য দোআ করতে থাকো। হ্যাঁ, মুসলমানদের গাফেল সন্তানদের দাওয়াত দিতে হবে এবং তাদের সিরাতে মুস্তাকীমের পথ দেখাতে হবে এবং গোপনে তাদের জন্য দোআ করতে হবে। হয়তো আল্লাহ তাআলা দোআ কবুল করবেন। আমরা কখনই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবো না।

প্রিয় ভাই : আপনিও নেখা পাঠাতে পারেন  
আমাদের পরিবাহয়  
নেখা পাঠানোর ঠিকানা:  
muftihasanintiaz@yahoo.com

# রমজান ও জিহাদ

-মুহসিনুল কারীম

মাহে রমজান এবং জিহাদের মাঝে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। যে ‘কُتِبَ’ শব্দটি দিয়ে আল্লাহ তাআলা রমজানের রোযা ফরয করেছেন সে ‘কُتِبَ’ শব্দটি দিয়েই আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। রোযা (সিয়াম) ফরয করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ الْخ...﴾

‘হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে।’ -বাকার:১৮৩

আর জিহাদ ফরয করতে গিয়ে এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

‘তোমাদের জন্য যুদ্ধ (জিহাদ) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিস অপছন্দ কর, অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভাল; আবার এমনও হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিস পছন্দ কর, অথচ সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ তাআলা জানেন (প্রকৃতপক্ষে কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ), আর তোমরা জান না।’ -বাকার-২১৬

জিহাদ এবং সিয়াম- এ দুটি বিধানে রয়েছে যথেষ্ট কষ্ট তদ্রূপ এ দুটিতেই রয়েছে তাকওয়া অর্জনের পর্যাপ্ত উপাদান। আর ইসলামী ইতিহাসে রয়েছে রমজানে সংঘটিত জিহাদের একটি দীর্ঘ তালিকা। নিম্নে আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে রমজান মাসে সংঘটিত জিহাদি তৎপরতার কিছু বিবরণ তুলে ধরছি।

রমজানে সংঘটিত ঐতিহাসিক কয়েকটি জিহাদঃ

## ১. ঐতিহাসিক বদরের জিহাদ:

ঐতিহাসিক এই জিহাদটি ২য় হিজরীর রমজান মাসে মক্কার কাফেরদের সাথে সংঘটিত হয়েছিল। এতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন আর কুরাইশের ইবলিসী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ (এক হাজার)।

২. ফাতহে মক্কা: ঐতিহাসিক এই জিহাদটি সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর রমজান মাসে। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৩. ফাতহে বুয়াইব: এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৩ তম হিজরীতে। ইরাকের কুফার সন্নিকটে। প্রতিপক্ষ পারসিক সৈন্যবাহিনীর সাথে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন মুসান্না বিন হারেসা রাযি।

৪. ফাতহুল নাওবাহ: এটি সংঘটিত হয়েছিল সুদানের মধ্য-উত্তরে এবং দক্ষিণে অবস্থিত **مقرة** (মুকিররাহ) এবং **علوة** (উলওয়াহ) নামক স্থানে আব্দুল্লাহ বিন আবু সাবেহ রাযি। এর নেতৃত্বে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ৩১ হিজরীর রমজান মাসে।

৫. বিলাতুশ শুহাদা: স্পেন এবং ফ্রান্স সীমান্তে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১১৪ হিজরীতে।

৬. ফাতহে উমুরিয়া: রোম সম্রাজ্যের সাথে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ২২৩ হিজরীতে।

৭. আইনে জালুত: বাইসান এবং নাবলুস এর সন্নিকটে অবস্থিত আইনে জালুতের যুদ্ধটি হয়েছিল ৬৫৮ হিজরীর রমজান মাসে।

৮. ফাতহে শাফহাব: তাতারীদের সাথে এ যুদ্ধটি হয়েছিল ৭০২ হিজরীতে।

৯. ফাতহে কাবরাস: রোমান সম্রাজ্যের সাথে জাযায়েরে আকবারে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ৮২৯ হিজরীর রমজান মাসে।

১০. মা'রেকাতুল মানসুরাহ: ফ্রান্সের সাথে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ৬৪৬ হিজরীর রমজান মাসে।

এ ছাড়াও ছোট-বড় আরো অসংখ্য যুদ্ধ রমজানে সংঘটিত হয়েছে। যেমন: সারিয়ায়ে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, যা ১ম হিজরীর রামজান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। আর ঐতিহাসিক এ সবগুলো যুদ্ধেই মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমজানের সিয়াম এবং রমজানের জিহাদের মাঝে সমন্বয় করে উভয় আমলের ফজীলত অর্জন করার তাওফিক দিন। আমীন।





# লাঞ্ছিত জাতি আর মজলুমের কান্না: এমন তো হবার কথা ছিল না ...

-যুবায়ের হুসাইন

প্রচণ্ড শব্দ। মুহূর্মহ বিস্ফোরণ। একটু বাঁচার আকৃতি। চোখের সামনে সাজানো বাগান তছনছ। আগুনে বলসে যাওয়া বাড়ি। পুড়ছে মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু। কাবাব হয়ে যাওয়া বাচ্চার কবর দিচ্ছে মা, কিংবা বাবা। ভাইয়ের লাশের পাশে বোনের চিংকার। রক্তের বন্যা।

অভিশপ্ত ইহুদিদের বিমান হামলায় লণ্ডভণ্ড গাজা। ঘোষণা দিয়ে মানুষ হত্যার উৎসবে মেতেছে শুরোরের দল। শুধু এটুকুই না। বড় গলায় বলছে-'They deserve it'! (এরা এরই উপযুক্ত) মার্কিন সন্ত্রাসী ওবামা বলছে তারা ইসরায়েলের পাশেই আছে। এই হামলার প্রতি তাদের সমর্থন আছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে ইসরায়েল এমনটা করার অধিকার রাখে। কিন্তু এমন তো হবার কথা ছিল না। আসুন চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে যাই।

ওমার ইবনুল খাতাব রাযি। এর সময়ের কথা। তিনি মদীনা থেকে যখন ইহুদিদের বহিষ্কারের আদেশ দিলেন, ইহুদিপ্রধান এসে তাঁর দরবারে ধর্না দিয়ে বলেছিল, 'আমীরুল মুমিনীন! কেন আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন, অথচ রাসূল সা. খাইবার বিজয়ের পর জিযিয়ার বিনিময়ে আমাদের থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।'

ওমার রাযি। এ কথা শুনে ধমকের সুরে বললেন, 'ওহে আল্লাহর দুশমন! সেদিন আল্লাহর রাসূল যা যা বলেছিলেন তার প্রত্যেকটি কথা আমার মুখস্থ আছে। তিনি বলেছিলেন, তোদের সাময়িকভাবে থাকতে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু অচিরেই এমন একটা দিন আসছে যখন এখান থেকেও তোদের বহিস্কৃত করা হবে আর তোদের উটগুলো তোদের নিয়ে এত দূরে চলে যাবে যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আজ সেই দিন এসে গেছে। আজ থেকে মদীনার পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের জায়গা নেই।'

যে ইহুদিরা মুসলিমদের দুয়ারে এসে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করত, একটু থাকার জায়গার জন্য ধর্না দিত, সেই ইহুদিরা আজকে মুসলিমের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। যাদেরকে আমরা কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতাম তারাই আজ আমাদের জায়গা দখল করে বসেছে। যারা ছিল লাঞ্ছিত, অপমানিত জাতি, তারা আজ আমাদের লাঞ্ছিত করছে, কেন? এই 'কেন'র উত্তর লুকিয়ে আছে ওমার রাযি। রই আরেকটি উক্তি।

খলিফা ওমার রাযি। আবু উবাইদা রাযি। কে সঙ্গে নিয়ে উটে চড়ে সিরিয়া যাচ্ছেন। পথে একটি উপকূলীয় খাঁড়ি পড়ায় উমার রাযি। নিজের জুতা খুলে কাঁধের ওপর নিলেন আর উটটাকে হেটে পার করাতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে ইতস্তত হয়ে আবু উবাইদা রাযি। বললেন, 'ওমার! আপনার এ আচরণ দেখে হয়তো গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারবেনা আপনি কত সম্মানিত মানুষ!'

ওমার রাযি। বললেন, 'হায় আফসোস আবু উবাইদা! আমি যদি অন্তত তোমার মুখে এমন কথা না শুনতাম! মনে রেখ, আমরা ছিলাম এক অপমানিত জাতি। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে সম্মান খুঁজতে যাই, আল্লাহ আমাদের আবার অপমানিত করবেন।'

মূল ব্যাপারটা এখানেই। আজকে আমরা ইসলামের মাধ্যমে সম্মান খুঁজতে ভুলে গেছি। পশ্চিমাদের গোলামির মধ্যে সম্মান খুঁজছি। আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ আজ ধুলি ধূসরিত। ইহুদি-খ্রিস্টানদের শেখানো পথে মর্যাদা পাবার চেষ্টা করছি। তাই আমরা আজ এক লাঞ্ছিত, অপমানিত জাতি।

২. 'পশ্চিমাদের থেকে ভালোটা নিতে আপত্তি কোথায়?'- এ জাতীয় প্রশ্ন আজকাল মুসলিমদের মুখে মুখে খুব ফেরে। বক্তব্যটা এই যে, পশ্চিমারা গড়পড়তা মুসলিম দেশগুলো থেকে আদর্শ, মূল্যবোধ, টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে আছে। তারা লোক ঠকায় না, খাদ্যে ভেজাল দেয় না, জুতা চুরি করে না। কাজেই তাদের ভালো দিকগুলো অনুসরণ করা যেতেই পারে।

আপত্তিটা এখানেই যে, আপনি যখন 'ভালোটা নেওয়ার' কথা বলে তাদেরকে ফলো করবেন, তখন তাদের সবকিছুই আস্তে আস্তে জাস্টিফিকেশন পেয়ে যাবে। ধরুন আপনি 'ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো'র ফ্যান। রোনালদোর খেলার কারণে আপনি তার ভক্ত। এখন যদি আমি বলি রোনালদো একজন খারাপ চরিত্রের ছেলে, তার ছেলে মায়ের পরিচয় জানেনা; আপনি রেগে উঠবেন। কিন্তু কেন? আমি তো রোনালদোর খেলার সমালোচনা করছি না!! বিষয়টা হল, আপনি রোনালদোর ভক্ত হওয়ার সাথে সাথে তার খেলার বাইরের ব্যাপারগুলোও আপনার কাছে গ্রহণ যোগ্যতা পেয়ে গিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

কাফেররা আমাদের সামনে একটা মুলোর মত টোপ বুলিয়ে দিয়েছে- আমাদের এই ভালো, সেই ভালো, আর মুসলিমরা মুলোর পিছে ছুটেই যাচ্ছে। আপনি কাফেরদের মধ্যে জুতা চোর পাবেন না, খাদ্যে ভেজালকারী পাবেন না। তাদের নৈতিকতায় আপনি মুগ্ধ।

একটু ব্রডার সেন্সে তাকাতে হবে ভাই। যে কাফেররা আমাদের কাছে নিজেদের আদর্শবান হিসেবে জাহির করার জন্য নৈতিকতার মুলো ঝুলায়, তাদের দেশই সাইকো, হোমসেক্সুয়াল, রেপিস্ট, স্মাগলার, আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। আপনি পশ্চিমা দেশে রাত দুটোর সময় দামি মোবাইল নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারেন দেখে বিস্মিত হন, অথচ আপনার দেশের সম্পদ তাদের কাছে নিরাপদ নয়!! এই যে ব্রিটিশরা, যারা আজকে বড় বড় নৈতিকতা আর গণতন্ত্রের বুলি ছাড়ে, তারা ধনী হয়েছে ডাকাতি

করে!! আজকে ব্রিটিশদের যে চাকচিক্য দেখে আপনি মোহগ্রস্থ হচ্ছেন, তাদের এ প্রচুর গড়ে উঠেছে আপনারই পূর্বপুরুষের রক্ত শুষে নিয়ে। আমাদের দেশের সম্পদ লুট করে ওরা নিজেদের আখের গুছিয়েছে। অথচ সেগুলো দেখে আমরা ওদের গুণ-কীর্তন করি, ওদের পোশাক গায়ে চড়িয়ে জাতে ওঠার স্বপ্নে বিভোর হই। গোলামী মনমানসিকতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে! আপনি ইসলামের কাছে সম্মান না খুঁজে সম্মান খুঁজে বেড়াচ্ছেন চোর-বাটপার সাদা চামড়াওয়ালাদের কাছে!

এই ভগ্নগুলোই দুদিন পরপর একেকটা মুসলিম দেশে গিয়ে বুঝিয়ে আসে মুসলিমরা পিছিয়ে আছে পশ্চিমাদের অনুকরণ না করার কারনে, নারী শিক্ষার অভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এমনিভাবে তারা আমাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধটা শূন্যের কোঠায় নিয়ে মুশরিকদের অনুসরণের মানসিকতা তৈরি করল, ভাবল মুসলিমদের জয় করা তো হয়েই গেছে! সত্যিই তাই।) এখন তারা যখন বলে হিজাব নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক, আমরা মাথা নাড়ি। তারা যখন বোঝায় দাড়ি সন্ত্রাসের প্রতীক, আমরা বলি- ‘ঠিকই তো।’

বুশ সেমিনার করে বলে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। আমরা খুশি হয়ে যাই। কথা হল, বুশ বলার কে? যে লোকটা রাতদিন সন্ত্রাস করেছে, লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তে যার হাত রঞ্জিত, তার কী অধিকার ইসলামের শান্তি নিয়ে বলা? বিশ্বের এক নম্বর টেররিস্ট বুশ যখন পবিত্র ইসলাম নিয়ে ধৃষ্টতা দেখায় তখন আপনার-আমার গায়ে আগুন জ্বলে ওঠার কথা। ওঠেনা। কারণ, আমরা সেই আত্মসম্মানবোধটা হারিয়ে ফেলেছি। তাই ওবামার মত নরপশুরা ইফতার পার্টি ডাকলে আমরা মুসলিমরা গদগদ হয়ে তাতে যোগ দিই।

ঠিক তেমনভাবে পশ্চিমা মুসলিম নারীদের ‘বন্দীত্ব’ নিয়ে কথা ওঠালেও আমাদের তাতে রক্ত গরম হয়না। যে দেশে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি, যাদের দেশে এক বছরে ২৬০০০ নারী সৈন্য যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, যে দেশে নারী যৌবন দেখিয়ে পয়সা কামায়; তারা ইসলামের নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলার সাহস দেখায় কীভাবে? দেখায়, কারণ তাদেরকে আমরা ‘নারী স্বাধীনতার’ প্রতীক মেনে নিয়েছি। তাই তারা বলে যাবে আর আমরা শুনে যাব এ অবস্থা তো আমরাই সৃষ্টি করে দিয়েছি।

পশ্চিমা যতই ‘আইন’ দেখাক, সেটা শুধু তাদের জন্যই প্রযোজ্য। আমি-আপনি তাদের কাছে নিরাপদ নই, কারণ আমরা মুসলিম! যে পশ্চিমা সৌদি আরবে মেয়েদের ড্রাইভিং এর অনুমতি না মেলায় উদ্ভিগ্ন হয়, তারাই কিন্তু আমাদের বোন ফতিমাদের কারাগারে নিয়ে একদিনে নয়বার ধর্ষণ করে। যারা শরীয়ার আইনকে বর্বর বলে, তাদের দেশে পিতার হাতে কন্যা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তবু এরা সভ্য!!

তাদের কিছু ‘ভালো’ যদি থেকেও থাকে, সেটা আমরা তাদের থেকে কেন শিখব? ইসলামে কি নৈতিকতা শেখার লোকের অভাব পড়েছে, যে আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত ইহুদি-খ্রিস্টানদের থেকে আমাদের ‘নৈতিকতা’ শিখতে হবে? যে ইহুদিদের সাথে জুতা, কলপ ব্যবহারের বিষয়েও পার্থক্য রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলেন রাসূল সা.। তাদের থেকে সভ্যতা শিখতে আমাদের এতটুকু লজ্জা হয়না!!

যে আমেরিকা-ইসরাইলিরা আমাদের শিশুদের জবাই করছে, ভাইদের বুক বাঁধার করে দিচ্ছে, বোনদের ধর্ষণ করে বেড়াচ্ছে,

তাদের থেকে আমাদের ‘জার্মেন্ট’ শিখতে হবে? তাদের থেকে আমাদের নৈতিকতা শিখতে হবে? একবার ভেবে দেখুন তো ওমার রাযি। যদি আজকে থাকতেন তবে আমাদের দেখে কী করতেন?

যারা পশ্চিমাদের থেকে ‘ভালোটা’ নেবার পক্ষে, তাদের সামনে পশ্চিমাদের নৈতিক অবক্ষয় যেমন হোমোসেক্সুয়ালিটির কথা ওঠালে কিন্তু তারা ‘ওটা ওদের কালচার’ বলে মেনে নেন। কত সুন্দর! তাহলে ওদের খারাপটা কোনটা? ভালোটাও নেবেন, ‘খারাপ’কে কালচার বলে জাস্টিফাইও করবেন, তবে আর অপমান এ জাতির জন্য না তো কার জন্য?

৩. মুসলিমদের মনে রাখতে হবে তারা হল অভিজাত সম্প্রদায়। তাদের মর্যাদা অন্যান্য জাতির উর্ধ্বে। ‘অমুসলিমরা এই-সেই আবিষ্কার করেছে, মুসলিমরা কেন পারল না?’ এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে, এগুলো অভিজাত সম্প্রদায়ের কাজ নয়। বাকিরা বরং এসব দিয়ে মুসলিমদের সেবা করবে। মুসলিমদের কাজ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

আমি আবিষ্কার-গবেষণা-বিজ্ঞান শিক্ষাকে ছোট করছি না। যেটা করছি সেটা হল- এগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের বিশ্বজয়ের অলীক স্বপ্নের বিরোধিতা। অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে যখন থেকে মুসলিমরা গণিত গণিত আর বিজ্ঞান বিজ্ঞান শুরু করল তখনই তাদের ওপর অপমান নেমে এসেছে। যখন জিহাদের মাধ্যমে আমরা কর্তৃত্ব করেছি তখন আমরাই ছিলাম বিজ্ঞানে সেরা, গণিতে সেরা। আজকে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে আমরা কলম দিয়ে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখছি, এটাই হল আত্মসম্মানবোধের অভাবের স্বরূপ।

ওমার রাযি. প্রতাপশালী সম্রাটের ভোজসভায় পড়ে যাওয়া খাবারের টুকরা দস্তুরখান থেকে তুলে খেতে সংকোচ করেননি। যারা করেছিল তাদের ব্যাপারে বলেছিলেন, ‘এসব বেওকুফ আর আহাম্মকের কথার কারণে আল্লাহর নবীর একটা সুন্যাহ লজ্জিত হতে পারে না।’

এটাই আত্মমর্যাদার স্বরূপ। আজকের মুসলিম বিশ্ব এটাই হারিয়ে ফেলেছে।

এক ভাই জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা-সামাজিকতা ইত্যাদির খুব প্রশংসা করছেন। বলছেন, সেখানে শিশুদের প্রাথমিক জীবনেই শেখানো হয় কীভাবে মানুষের সাথে আচরণ করতে হয়, কেউ কিছু দিলে ধন্যবাদ দিতে হয় ইত্যাদি।

সুবহানআল্লাহ! ইসলামের কি এই ব্যাপারে কোনই নির্দেশনা নেই? ইসলাম কি আরো চমৎকারভাবে আচরণ শেখায় না? কিন্তু আমাদের কেন জাপানের কাছ থেকে আদব শিখতে হবে? আমরা কেন আল্লাহর রাসূল সা. এর কাছ থেকে আদব শিখতে চাচ্ছি না?

কারণ ঐ একটাই। আমরা সম্মান খুঁজছি কাফেরদের জীবনাচরণ থেকে, তাদের ‘চাকচিক্য ভরা দুনিয়া’ দেখে মুগ্ধ হয়ে।

আজকে পশ্চিমা দাঙ্গিরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের অনুসরণে মুসলিমদের উন্নত হবার পরামর্শ দেন। হ্যাঁ, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমাজকে প্রভাবিত করার চলটা মুসলিমদের থাকা উচিত-এ বক্তব্যের বিরোধিতা আমি করছি না। কিন্তু সেই বুদ্ধিবৃত্তির মানদণ্ড কী? সেটা কি এই যে ওদের সৃষ্ট গণতন্ত্র-সেকুলারিজমের ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্র গড়তে হবে? ওদের দেখিয়ে দেওয়া গণিত-বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্বজয় করতে হবে? আমি অবশ্যই বিজ্ঞান শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করছি না। আমি নিজেও বিজ্ঞানের ছাত্র; কিন্তু এই বিজ্ঞান কীসের জন্য? একটা এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে ওদের ড্রোন বানাতে হেল্প করা, যে ড্রোন দিয়ে ওরা মুসলিমদের মারবে? এরই নাম বিজ্ঞানমনস্কতা?



এই যে মুসলিম যুবকেরা ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার হবার পেছনে হন্য হয়ে ছুটেছে, কেন? ‘মানবসেবা’র বুলি যতই আওড়ানো হোক না কেন, ডাক্তারি পড়ার পেছনে মূল উদ্দেশ্য একটা ‘সিকিউরড লাইফ’। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে মানুষ পশ্চিমে যায় কেন? ঐ একই কারণ।

একটা জিনিস প্রায়ই দেখি। আমরা মুসলিমরা ফেসবুকে ‘Proud to be a Muslim’ লিখতে খুব পছন্দ করেন। আপনি কি আসলেই মুসলিম হয়ে গর্বিত? একটু চিন্তা করুন তো, আপনি কীভাবে খেতে পছন্দ করেন? আপনি কি পা ভাঁজ করে খেতে পছন্দ করেন যেমনটা সুন্নাহ? আপনি কি কোন অনুষ্ঠানে ভরা মজলিসের সামনে মিসওয়াক ব্যবহার করতে গর্ববোধ করেন? আপনি কি কোন বিয়ের জমকালো অনুষ্ঠানে টাখনুর ওপর প্যান্ট উঠিয়ে যেতে পছন্দ করবেন? এর মাধ্যমে নিজেকে গর্বিত বোধ করবেন? আপনি কি নিজের চেয়ে বয়সে ছোট কাউকে আগে সালাম দিতে পছন্দ করেন?

উত্তর যদি ‘না’ হয়, তবে নিশ্চিত থাকুন, আপনি ইসলামের মধ্যে, রাসূল সা. এর সুন্নাহর মধ্যে সম্মান খুঁজছেন না। আপনার Proud to be Muslim কথাটা মূল্যহীন, একেবারেই মূল্যহীন। আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন না। আপনি গোলামির মধ্যে সম্মান খুঁজছেন।

মূল ব্যাপারটাই এটা। আপনি তখনই পশ্চিমাদের উন্নতি দেখে মোহগ্রস্ত হবেন যখন আপনি তাদের কালচারকে ঘৃণা করতে পারবেন না। আর তাদের কালচারকে ঘৃণা করতে হলে ইসলামের কালচারকে ভালোবাসা আবশ্যিক।

আমার এক বন্ধু দাড়ি রাখা শুরু করেছিল। হঠাৎ একদিন দেখি ক্রিন শেভড। জিজ্ঞেস করলাম বিষয়টা কী। বলল প্রেজেন্টেশন ছিল তো তাই দাড়ি কমিয়েছে, নাহলে মার্ক একটু কমিয়ে দিতে পারে।

প্রেজেন্টেশনের সময় স্যুটেড-বুটেড হতে হবে, মুখে পৌরুষের চিহ্ন থাকা যাবে না, থাকলে মার্ক কম দেবে-এগুলো নিয়ম কে বানিয়েছে জানিনা। সমস্যা সেটা না। সমস্যা হল যে, আমরা মুসলিমরা সেটা মেনে নিয়েছি। সামান্য মার্কার জন্য রাসূল সা. এর এত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহটা বর্জন করলাম। কারণ ঐ একটাই, আত্মমর্যাদার অভাব। আমি মুসলিম হয়ে মুশরিকদের অনুকরণ করছি-এটাকে ঘৃণা করতে না শেখা। ‘হিজাব’ পরা একটা মেয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে হিজাবটা খুলে যায়-তার পেছনেও ঐ একই ব্যাপার। সে হিজাবকে ফ্যাশন হিসেবে নিয়েছে, দীন হিসেবে নেয়নি। হিজাব তার গর্ব না, বোঝা। মার্কার দোহাই হোক আর সামাজিকতার দোহাই হোক, আল্লাহ্ যা দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন আমি তা অবজ্ঞা করে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে অপমানিত বোধ করিনা। পরাজিত মানসিকতার সূচনা এখান থেকেই।

৪. আসুন এবার দেখি আল্লাহর রাসূল সা. মুসলিম জাতির এ দুর্দশা সম্পর্কে কী বলে গেছেন।

রাসূল সা. বলেছেন, ‘যদি তোমরা আর্থিক লেনদেন এবং গরুর লেজ অনুসরণ কর এবং কৃষি পেশায় পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং জিহাদ প্রত্যাখ্যান কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা অবতরণ করবেন। যা ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।’ -আবু দাউদ - হাদীস নং ৩৪৫৫

হাদীসটি খেয়াল করুন। বলা হয়েছে- গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকলে আমরা লাঞ্ছিত হব। এই যে অর্থনৈতিক মুক্তি আর কৃষি-শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়ে দুনিয়া পালটে ফেলার স্বপ্নে বিভোর আমরা,

এটাই হল গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকা। রাসূল সা. সমাধানটা বলেও দিয়েছেন-দীনের দিকে ফিরে আসা। যখন আমরা দীনদারীতে এগিয়ে ছিলাম তখন অর্থনীতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতাম, ক্ষমতা আমাদেরই ছিল, বিজ্ঞানে আমরাই প্রতিনিধিত্ব করেছি, বিশ্ব আমাদের কথা মানতে বাধ্য হত। আজকে এ সব কতৃৎ হারানোর মূলে একটাই কারণ-দীন থেকে দূরে সরে যাওয়া। ইসলামকে সম্মানের বস্তু ভাবতে না শেখা। জিহাদকে ভুলে থাকা।

ওমার রাযি. এর সময়ে কিছু সাহাবী জিহাদ ছেড়ে খামার তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। উমার রাযি. সেইসব জমির ফসল পুড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমাদের কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমাকে সম্মুখ রাখতে। খামার আবাদ করা ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাজ, ওরা চাষ করে তোমাদের খাওয়াবে। তোমাদের কাজ জিহাদ চালিয়ে যাওয়া আর ইসলামের পতাকাকে প্রতিষ্ঠিত করা।’

এটাই মুসলিম যুবকের ভিশন। তাদের আগমন হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে কায়ম করতে, আল্লাহর দীনের শত্রুদের নির্মূল করতে।

জিহাদের জন্য কী দরকার? অবশ্যই শত্রুদের প্রতি ঘৃণা, আর মুসলিম হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধ। শত্রুদের সামনে নতজানু হয়ে কোনদিন বিজয় অর্জন সম্ভব না। পশ্চিমা কালচার আর তাদের মেকি এর চাকচিক্য আমার-আপনার অন্তর থেকে সেই ঘৃণা তুলে নিয়েছে।

রাসূল সা. বলে গেছেন কাফেরদের অন্তর থেকে মুসলিমদের ভয় তুলে নেওয়া হবে, যখন তারা জিহাদ থেকে সরে যাবে। আজকে মুসলিম উম্মাহ ইসলামকে সম্মান ভাবতে পারছে না, জিহাদকে ভালোবাসতে পারছে না, শাহাদাতকে গৌরব ভাবতে পারছে না। তাদের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে ‘ওয়াহান’ অর্থাৎ জীবনের প্রতি ভালোবাসা আর কিতালের প্রতি ঘৃণা। আর তাই তারা সর্বদিকে লাঞ্ছিত, অপমানিত এক মজলুম জাতি।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট। ইসলামের শত্রুদের সমস্যা কোন টেররিজম না, কেবল ‘ইসলাম।’ যে নিষ্পাপ বাচ্চাদের হত্যা করা হচ্ছে তারা কোন সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত বলতে পারেন? তালিমারা কাপড়ের আমীরুল মুমিনীনের নাম শুনলে থরথর করে কাঁপত যে গুয়ারগুলো, তারা আজ আমাদের বাচ্চাদের জবাই করে, আমাদের মা-বোনদের গায়ে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়। যারা আজ ফিলিস্তিনে শহীদ হচ্ছে তারা তো জান্নাত পেয়ে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। দায় থেকে যাচ্ছে আমাদের। আমরা কোন মুখ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব? কী জবাব দেব যেদিন এই মৃত শিশুরা আল্লাহর দরবারে বিচার দেবে কাপুরুষ উম্মাহর বিরুদ্ধে? কাজেই উপায় একটাই। কাফেরদের প্রতি সেই কঠোর মনোভাব ফিরিয়ে আনতে হবে। রক্তের বদলা রক্তেই নিতে হবে, তরবারির জবাব তরবারিতেই। নতজানু মুসলিমেরা আজকে কাফেরদের অনুরোধের সুরে বলে- Stop killing in Gaza! Stop killing innocent children!!

আহারে!! আল্লাহর দুশমনদের সাথে কত বিনয়ের সুরে কথা! আল্লাহর কসম, আল্লাহর দুশমনদের রক্তে হাত রঞ্জিত না করে মুসলিম যুবকদের হৃদয় শান্ত হতে পারে না।

পরিশেষে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর ভাষায় বলি- ‘সভা-সমাবেশ-আলোচনার সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন কথা হবে রাইফেলের ভাষায়।’





## শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. -এর ঐতিহাসিক ফতোয়া: ভারত 'দারুল হরব'

১৮০৩ সাল। ইংরেজরা বিজয়ের বেষ্টে দিল্লীতে প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে জোরপূর্বক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর আদায় করে নিলো যে, 'সৃষ্টি আল্লাহর, সাম্রাজ্য সম্রাট বাহাদুরের; কিন্তু আইন-কানুন চলবে বৃটিশ কোম্পানীর'

এই চুক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ থেকে ইসলামী আইন-কানুনের যবনিকা গুরু হলো, আর মানবরচিত কুফরি আইনের আশ্রাসন গুরু হলো।

ব্যস, তখনকার শ্রেষ্ঠ আলেম শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া জারী করলেন। ফতোয়াটি ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছিল। ফতোয়াটির ১৭ নম্বর পৃষ্ঠার উর্দু থেকে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো।

'এই শহরে ইমামুল মুসলিমীনের আদেশ মোটেও প্রয়োগ হচ্ছে না, অথচ খৃষ্টান অফিসারদের নির্দেশাবলী বিনা-বাঁধায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। কুফরের আইন চলার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রজাদের নিয়ম-কানুন, খেরাজ, উশর, ব্যবসার পণ্য, চোর-ডাকাতদের থেকে রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম-কানুন, মামলাসমূহের রায় এবং অপরাধীদের শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাফেরই শাসনকর্তা হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেলো।

এখানে যদিও তারা কিছু ইসলামী আহকাম যেমন- জুমআ, দুই ঈদের আযান এবং গাভী কুরবানীর ক্ষেত্রে (আপাতত) কোনো বাঁধা দিচ্ছে না, কিন্তু এই বিষয়সমূহের গৌড়ার মূলনীতি (অর্থাৎ দীনি স্বাধীনতা এবং ইসলামি নিদর্শনসমূহের মূল্যায়ন) তাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে অহেতুক এবং অবাস্তব।' (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, ২/৮৬, থেকে তেহরীকে আযাদী / মুফতি সাযিদ্ সালমান মনসুরপুরি, ১৮-১৯)

এই ফতোয়ার পর শুরু হলো ইংরেজবিরোধী জিহাদ। একে একে ঘটে গেলো বালাকোট, শামেলীর ইমারাহ ইসলামিয়াহ এবং রেশমী রুমাল আন্দোলন। যদি আমরা ঐতিহাসিক এই ফতোয়ার উপর একটু দৃষ্টি বুলাই তাহলে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবো।

১. ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দিল্লীতে মুসলিম মোঘল সম্রাটরা ছিলেন তাহলে কেনো এই ফতোয়া ?

২. দেশের শাসক যদি মুসলিম নামধারী তাগুত হয় আর আইন-কানুন যদি ব্রিটিশের হয় তাহলে কি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বৈধ ?

৩. ইসলাম কি শুধু সালাত-সিয়াম এবং জুমআ ও দুই ঈদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ? যদি এসব প্রশ্নের উত্তর থেকে প্রতীয়মান হয়

যে, জিহাদ ফরযে আইন, তাহলে কেনো বর্তমানে এই দেশে চূড়ান্ত জিহাদের ডাক দেওয়া হচ্ছে না ?

যখন আমরা জিহাদের কথা বলি, তখন কিছু ভাই বলেন, তাহলে কেনো তোমরা বসে আছো? ময়দানে নেমে আস? আমরা তাদেরকে বলি, ভাই, একবার কোনো এক পুলিশকে জিজ্ঞেস করো যে, তাকে পুলিশ হতে কতদিন লেগেছে? অথচ এরা তো পূর্ণ সামরিক বাহিনীই নয়? জিহাদ তো পিকেটিং নয় যে কয়েকটি ইট-পাটকেল আর হাতবোমা ছেড়ে দিলেই আদায় হয়ে যাবে ?

এবার তাহলে জিজ্ঞেস করো, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হতে কতদিন লেগেছে? এবার আসুন, অতীতে ফিরে যাই। দেখুন, নবীজী সা. যখন মক্কা থেকে মদীনার পথে 'গারে সাউর' যখন ছেড়ে বের হলেন, তখন কিন্তু জিহাদ তথা কিতালের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে। তাহলে কেনো নবীজী সা. মদীনার পথ ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে জিহাদ করলেন না?

১৮০৩ সালে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং আপন ছাত্র সাযিদ্ আহমদ শহীদ বেরেলভী রহ. কে ময়দানে পাঠিয়েছিলেন জিহাদ করার উদ্দেশ্যে। অথচ এই সাযিদ্ আহমদ শহীদ রহ. ১৮২৬ সালে গিয়ে প্রথম অভিযান পরিচালনা করলেন।

এতো পরে কেনো ? তাহলে এতো বছর তিনি কী করেছিলেন ? 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী' গ্রন্থটি পড়ে দেখুন, দেখবেন, তিনি প্রথমে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, এরপর মুজাহিদদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন; তারপর না ১৮২৬ সালে প্রথম আক্রমণ করলেন। এরপরই না তিনি সোয়াত-মালাকান্ডে ইমারাতে ইসলামিয়াহ প্রতিষ্ঠা করলেন।

উনারা যে ধারাবাহিকতায় ময়দানে এসেছিলেন। আমরা সে ধারাবাহিকতায় আসবো। আমাদের দেশে তো অতীতের লোকদের মতো কেউ শৈশব থেকে অস্ত্র পরিচালনা এবং অশ্চালনা শিখেনা। আর এই ধারাবাহিকতাকে শাযখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহ. চার ভাগে করেছেন: ১. দাওয়াত ২. ইদাদ (প্রস্তুতি) ৩. রিবাত- প্রাথমিক হামলা (নিরাপদ ভূমি প্রতিরক্ষা) ৪. কিতাল- একটি অঞ্চল দখল করে চূড়ান্ত যুদ্ধ

অন্যথায় শেকড় মজবুত না করে শুধু বোমা ফাটিয়ে শিখড়ে পৌছা যাবে না। যারা এই বৈশ্বিক জিহাদের কাণ্ডারী তাদের কৌশলের উপর আস্থা রাখুন, তাদের সাথী হোন। ইনশাআল্লাহ !

আর দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তাআলা সবাইকে অতিশীঘ্রই এই কাফেলার সাথে শরিক হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

# আপনার ছেলে-মেয়েরা আমার সিঁড়িঘরে কী করে?

আমাদের অফিস চারতলা থেকে পাঁচ তলায় এক্সটেনশন করেছে গত মাসে। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। তবু আমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমি উপরে চলে গেছি। আমি সেদিন যোহরের সালাত আদায় করতে নিচে নামবো। বের হতে গিয়ে যেই না দরজাটা ভেতর থেকে টান দিয়ে খুলেছি; একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আচমকা প্রায় ফ্ল্যাটের মধ্যে পড়ে যেতে গেলো। তারা দু'জনই বাইরে থেকে দরজায় হেলান দিয়ে দাড়িয়েছিল। আমি তো অবাক! এক জোড়াই নয়, তার সাথে সেখানে আরো দু'জোড়া টিনেজ ছিলো সেখানে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, তারা উপরে একটি ইংলিশ মিডিয়াম কোচিং সেন্টারে এসেছে পড়ার জন্য।

মাস ছ'য়েক আগের কথা। আমি আমার মেয়ের পড়ার জন্য একজন মহিলা হোম টিউটর খুঁজছিলাম। আমার বাসার কাছেই একটা কোচিং সেন্টার আছে। ভাবলাম, সেখানে গেলে হয়তো পাওয়া যাবে। তো মাগরিবের সালাহ আদায়ের জন্য একটু টাইম হাতে নিয়ে নামলাম; যেন আগে সেখানে গিয়ে এসে জামা'আত ধরতে পারি। দোতলার সেই কোচিং সেন্টারে উঠে তো আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। ক্লাসরুমে টিচারদের কাউকে দেখলাম না। তারা তাদের রুমে। দেখলাম সন্কার আলো-আধারিতে প্রায় প্রতিটি রুমেই দু' তিনটি জোড়া ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে 'কোচিং' করছে। এমন 'আদর্শ' স্থান থেকে মেয়ের জন্য টিচার নেওয়ার কথা ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে উঠলো। চলে এলাম তখনই। একটু ধৈর্য ধরতে হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমার মেয়ের জন্য পর্দানাশীন একজন ভালো টিচার মিলিয়ে দিয়েছেন।

আমার বাসার এলাকাতেই একটি বেশ ভালো কোচিং সেন্টার ছিলো। নাম প্রতিশ্রুতি কোচিং। আমার পরিচিত ক'জন আদর্শবান তরুন মিলে এটি আরম্ভ করেছিলো। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলো শোভন ও ফরিদ ভাই। ইন্টারমিডিয়েট কোচিং এখান থেকে করে মেডিক্যাল, বুয়েট, ঢাবি সহ প্রথম সারির অনেক প্রতিষ্ঠানে চান্সও পেয়েছে অনেকে। আমাকে তারা মাঝে-মধ্যে দাওয়াত করতো ছাত্রদের চরিত্র গঠন বিষয়ে কিছু বলার জন্য। বছর তিনেক পর শুনলাম, আমার সেই পরিচিত তরুণরা গরুর ফার্ম করার উদ্যোগ নিয়েছে। হালাল উপার্জনের জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন কোচিং এর কী হলো? তারা জানালো যে, তারা মেয়েদেরকে এখানে পড়ায় না বিধায়, মেয়েদের তো আসার সুযোগই নেই, ছেলেরাও এখানে পড়ে 'মজা' পায় না। তাই বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে সেন্টারটি বন্ধই করে দিতে হয়েছে।

এর প্রত্যেকটি সত্য ঘটনা। আমি নিজেই এর প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষদর্শী।

টিনেজ বয়সটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বয়স। এই সময়ে কিশোর কিশোরীদের বিশেষ করে বর্তমান সমাজের- মধ্যে ভালো-মন্দ বোঝার মতো কোনো পরিপক্বতা তৈরি না হলেও অপরাধ করার মতো শারীরিক ও মানসিক সকল সক্ষমতাই থাকে। কোন কাজের কী পরিণতি হতে পারে তা ভাবার মতো বুদ্ধি-জ্ঞান তাদের মধ্যে কাজ করে না। ক্ষণিকের ভালো লাগা, মন মাতানো আনন্দ, মাদকতা আর নিষিদ্ধ জিনিস তাদেরকে এমনভাবে টানে যে, তারা তা পাওয়ার জন্য যেকোনো রকম ঝুঁকি নিয়ে ফেলতে পারে।

তাই এই বয়সটাতে বাবা-মা'দের মোটেই উচিৎ নয় তাদেরকে কোনো বাছবিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়া যেখানে সেখানে যেতে দেওয়া, যার তার সাথে মিশতে দেওয়া। আপনার সন্তান পড়ার নাম করে কোথায় যাচ্ছে; সেখানকার পরিবেশ কেমন সে সম্পর্কে যথাযথ খোঁজ খবর অবশ্যই আপনার রাখা উচিৎ। যে কোনো অকল্যাণকর কাজ ও পরিবেশ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা উচিৎ। তবে এটা জোর করে বন্ধ না করে এর ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝিয়ে বন্ধ করা অবশ্যই ভালো। তবে হ্যাঁ, যদি তারা বুঝ না নিতে চায় তবে একটু যত্নের সাথে জোর করে হলেও তাদেরকে নিয়ম শৃংখলার মধ্যে রাখতে হবে।

আপনার শিশু সন্তান যদি ইলেকট্রিক ছকেটের ভেতর হাত ঢুকাতে চায় আপনি কী করেন? যদি ধারালো কিছু নিয়ে খলতে চায় আপনি কী করেন? যদি গ্যাসের চুলার কাছে যায় কী করবেন? তারা চাইলেই কি আপনি তাদেরকে এসব করতে দেন? দেন না। তাহলে সেই প্রাণপ্রিয় সন্তানটি একটু বড় হবার পর কেন আপনি গাছাড়া ভাব দেখান? যেসব বিষয় তার স্বভাব-চরিত্র ও গোটা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সেখানে আপনি কিভাবে আপোষ করেন?

আপনার সন্তানকে যদি আপনি তার নিজ ইচ্ছা-মর্জির উপরই ছেড়ে দেন তাহলে আপনার তো আর কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার একটু যত্নশীল কঠোরতা তার জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর আপনি যদি তার বন্ধু হতে গিয়ে তার কথামতো চলা শুরু করেন; আর একারণে যদি তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এক সময় এই সন্তানরাই আপনাদেরকে দোষ দেবে। বলবে তোমরা কেমন বাবা মা ছিলে? তোমরা কেন আমাদেরকে জোর করে সঠিক পথে রাখোনি? কেন আমাদেরকে সঠিক বুঝ দাওনি?

আমাদের সমাজে কিশোর অপরাধের যে চিত্র আমরা পত্রিকার পাতায় দেখি, তা তো আপনিও দেখেন। নিজ ক্লাসমেটে কে হত্যা করে খেলার মাঠের পাশে বালু চাপা দিয়ে রাখা; ঘুমের ট্যাবলেট

খাইয়ে মধ্য রাতে ঐশির বাবা-মাকে হত্যা করার ঘটনা তো কারোই অজানা নয়। এমন আরো অসংখ্য কিশোর অপরাধের ঘটনা প্রতি দিন পত্রিকার পাতায় আসে। কিন্তু তবুও আমাদের হুশ হয় না। আমরা সবসময়ই কোনো এক অজানা কারণে ভাবি ‘আমার সন্তানরা’ তেমনটা করবে না। মনে করি, এরা তো খারাপ কিংবা দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়ে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। এদের অধিকাংশই আপনার আমার মতো তথাকথিত ভদ্র পরিবারের সন্তান।

প্রত্যেক বাবা-মাই নিজ সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা পোষণ করেন। করাটাই স্বাভাবিক। আর ভালোবাসা যে মানুষকে অন্ধ করে দেয় এটা শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই কিন্তু নয়। সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রেও হয়। নিজ সন্তানের একটা নিষ্পাপ প্রতিচ্ছবি মনে সারাক্ষণ সেটে থাকার কারণে আমরা ভয়ংকর বাস্তব অভিজ্ঞতার শিকার হওয়ার আগে কখনোই তাকে অপরাধী ভাবতে পারি না। মনে করি, এতোটুকু মাত্র ছেলে/মেয়েটি! কী আর বোঝো! আমার ছেলে/মেয়ে কি এই কাজ করতে পারে? কিন্তু আমরা চোখ বুজে থাকলেই কিন্তু বাস্তবতা কখনো পালটে যাবে না।

অতএব মধ্য রাতে নিজ সন্তানের হাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগেই সতর্ক হোন। আপনার মেয়েটি বিয়ের আগে গর্ভবতি হয়ে পড়ার আগেই সতর্ক হোন; মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার আগেই খবর নিন, আপনার ছেলেটি বখে যাওয়ার আগেই তার তত্ত্বাবধানে যত্নশীল হোন। আপনি যদি সত্যিই মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে ভুলে যাবেন না যে, সেও একটি মানব সন্তান। মানব সন্তান কুকুরছানা নয় যে, খাবার আর থাকার জায়গা পেলেই চলে যাবে। বুঝবেন না তার যত্ন মানে কেবল তার উন্নত খাবার, অভিজাত ফ্ল্যাট, দামী জামা-কাপড় আর লেটেস্ট তথ্য-প্রযুক্তির উপকরণ হাতে তুলে দেওয়া।

সন্তানের তত্ত্বাবধানের সর্ব প্রধান কাজ হলো তাকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। সকল নৈতিকতা থেকে বাচিয়ে রাখা। আদর্শবান করে গড়ে তোলা। আপনার সন্তান কোনো পশুর বাচ্চা নয়, যে নিছক বস্তুগত চাহিদা পূরণ হলেই তার চলে যাবে। রাস্তাঘাটে আজকাল মেয়েরা যে ধরনের কাপড়-চোপড়ে বের হয় তা দেখে ভাবি, কোনো বাবা-মার চোখের সামনে দিয়ে এমন পোষাক পরে কিভাবে তারা বের হয়ে আসতে পারে? লজ্জা-শরম না হয় খেয়েই বসেছে, এদের কি রুচিবোধ বলতেও কিছু নেই? শালীনতা শব্দটি কি এদের ডিকশনারি থেকে হারিয়ে গেছে? এরা সত্যিই বাবা মা, নাকি নিছক ‘মানুষের ছাও উৎপাদনকারী’?

প্রখ্যাত লেখক মির্জা ইয়ার বেইগ তার সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক বইতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন। তিনি বলেন,

“আজকাল অনেক বাবা-মাই অভিভাবক হওয়ার বদলে সন্তানদের ‘বন্ধু’ হতে চায়। আর তাই বাচ্চাদের প্রতি সদয় হতে গিয়ে তাদের সকল চাওয়া পূরণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন এই সন্তানরা অভিভাবক ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। বাবা-মারা সব কিছুতেই সন্তানদের সাথে আপস করতে থাকে এবং সন্তানরাও তাদের উপর চাপ

প্রয়োগ করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি আদায় করতে পারে। ফলে বাচ্চাদের চাওয়া-পাওয়ার সীমারেখা দিন দিন বাড়তেই থাকে। তাই বাবা-মাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সন্তানদের অনেক বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু বাবা-মা কেবল তারা দুজনই। তারা সন্তানদের অভিভাবক। বাবা-মায়ের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা পালন করাটা তাদের জন্য মোটেই ভালো নয়। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান যেন সত্যিকার আদর্শ-মানুষ হয় সেভাবে প্রতিপালন করা এবং এটাই তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ”।

(বইটির ইংলিশ ভার্শনের নাম Bringing up a Muslim child অনুদিত বাংলা সংস্করণ ও মূল ইংলিশ- উভয়টিই সিয়ান পাবলিকেশন থেকে বের হতে যাচ্ছে ইনশা আল্লাহ)

যে তিনটি ঘটনাচিত্র দিয়ে আমি লেখা শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে আসি। আজ আমাদের কিশোর কিশোরীরা যেসকল কারণে বখে যাচ্ছে তার মধ্যে সামাজিক পারিবারিক অনেক কারণ রয়েছে নিসন্দেহে। আমি শুধু এখানে ফোকাস করতে চেয়েছি এই কিশোর বয়সে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার দিকটিতে। আর এর অন্যতম একটি কেন্দ্র হচ্ছে এই কোচিং সেন্টারগুলো। তবে এটা যে শুধু কোচিং সেন্টারে হয়, তা-ই নয়। সহশিক্ষার স্কুল; এমনকি অসচেতন অনেক বাবা-মায়ের ঘরেও এমনটি হয়।

এভাবেই তারা এই অল্প বয়সে অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আজকাল ইন্টারনেট, কম্পিউটার সহ তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের কারণে তারা শরীর তত্ত্বের এমন অনেক কিছুই জানে, যেগুলো হয়তো আপনি কেবল বিয়ের পরেই জেনেছেন। এসব বিষয়ের পরিণতি নিয়ে ভাবার মতো পরিপক্বতা না থাকলেও হেমিলিয়ানের বাশির মতো তা তাদেরকে মোহহস্ত করে ফেলে।

যেহেতু এই বয়সটি মারাত্মক আবেগ প্রবণ একটি সময়। তাই এই সম্পর্ক তাদের মন-মননের উপর ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে। মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, সাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। লেখা-পড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। বাবা-মা ও পারিবারিক পবিত্র বন্ধন তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আর এই মানসিক দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তখন তারা মাদকের আশ্রয় নেয়। মাদকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে হয় চোর, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ইত্যাদি। ধংস হয়ে যায় একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। হ্যা, এটা আপনারই সন্তানের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

আমি আপনাকে কোনো আখিরাতে মুক্তির ওয়াজ করছি না। আপনার পরিবারের শান্তির কথা বলছি। অশান্তি থেকে বাচার কথা বলছি। যা আপনার জীবনের প্রতিটি দিনকে প্রভাবিত করবে, আমৃত্যু। আখিরাতে আপনি কতোটা বিশ্বাস করেন, সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আপনার বখাটে ছেলে বা মেয়েটা তো এই সমাজেরই অংশ। তার বখাটেপনার শিকার শুধু আপনি একাই হবেন না, আমিও হতে পারি; এই সমাজের আরো পাঁচ জন হতে পারে। নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য আপনার সন্তান আপনাকে রান্না ঘরের দাও-বঠি নিয়ে তেড়ে আসতে পারে। গলির মাথায় আমার পেটে ছুরি ঠেকাতে পারে; কারো হাতের মোবাইলটি নিয়ে দৌড় দিতে পারে। কি, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনার সোনামনিটি এই কাজ করতে পারে?

ঐশির বাবা-মাও কিন্তু এমনটিই মনে করতো। তাদের সেই ‘মনে করা’ দিয়ে কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। অতএব সময় থাকতে সচেতন হোন। এক্ষুনি। হ্যা, এক্ষুনি। আর কারো জন্য নয়, অন্য কারো স্বার্থে নয়। আপনার নিজের জন্য, নিজের স্বার্থেই।



# বনি ইসরাইলের বারসিসা এবং আমাদের গল্প...

-হাসান তারেক

বারসিসার এই কাহিনী হয়ত অনেকেই শুনেছেন। বারসিসা ছিল বনী ইসরাইলের একজন সুখ্যাত উপাসক, ধর্মযাজক, 'আবেদ'। তার নিজের উপাসনালয় ছিল। সেখানে সে নিবিষ্টমনে উপাসনায় মগ্ন থাকত। বনী ইসরাইলের তিন সহোদর জিহাদে যেতে চাচ্ছিল তবে নিরাপত্তা দেখা দিল তাদের একমাত্র বোনটিকে নিয়ে। তাকে কোথায় রেখে যাবে বুঝতে পারছিল না। তারা সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কোথায় আমরা আমাদের বোনকে রেখে যেতে পারি? তাকে তো আমরা একা ফেলে যেতে পারি না। কোথায় তাকে রেখে যাওয়া যায়?' তখন লোকেরা তাদেরকে বলল, 'তাকে রেখে যাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হবে ঐ উপাসকের ধর্মালয়। সে-ই সবচেয়ে ধার্মিক, আর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তোমাদের বোনকে তার কাছে রেখে যাও, সে তার খেয়াল রাখবে'। তারা আবেদের নিকট গেল। তাকে সব অবস্থা জানিয়ে বলল, '-আমরা জিহাদে যেতে চাই, আপনি কি কষ্ট করে আমাদের বোনকে দেখে রাখতে পারবেন?' সে বলল, 'আমি তোমাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আমার কাছ থেকে চলে যাও'। তখন শয়তান তাকে এ বলে প্রলুব্ধ করল, 'তুমি মেয়েটিকে কার কাছে রেখে আসবে? তুমি যদি তার খেয়াল না রাখো তাহলে হয়ত সে কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়বে। আর তারপর তো তুমি জানোই কী ঘটবে! তুমি কী করে এই ভাল কাজটা হাতছাড়া করে দিতে পার?'

দেখুন ! শয়তান তাকে ভাল কাজে উৎসাহিত করছে! তো সে তাদেরকে আবার ডেকে এনে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তার খেয়াল রাখব, কিন্তু সে আমার সাথে আমার ধর্মালয়ে থাকতে পারবে না। আমার আরেকটা বাড়ি আছে সে সেখানে থাকবে'। সে মেয়েটিকে বলল, 'তুমি ওখানে থাক, আমি আমার গির্জায় থাকব'। তো মেয়েটা সেই বাড়িতে একটা ঘরে থাকত, আর সেই ধর্মযাজক তার জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে এসে দরজার বাইরে রেখে চলে যেত। সে মেয়েটির ঘরে পর্যন্ত যেত না; দরজার বাইরেই খাবার রেখে দিত আর মেয়েটিকে ঘর থেকে বের হয়ে এসে খাবার নিয়ে যেতে হত। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পর্যন্ত চাইত না। তখন শয়তান আবার তার কাছে এসে বলল, 'তুমি করছটা কি? তুমি কি জানো না মেয়েটা যখন তার ঘর থেকে বের হবে

আর তোমার গির্জা পর্যন্ত আসবে লোকে তাকে দেখতে পাবে? তোমার উচিত তার দরজায় যেয়ে খাবারটা রেখে আসা।' সে ভাবল, ঠিকই তো!

শয়তান কিন্তু তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলছেন, তাকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। ধর্মযাজক 'আবেদ তাই এবার খাবার নিয়ে মেয়েটির দরজা পর্যন্ত রেখে আসতে শুরু করল। এভাবে কিছুদিন চলল। এরপর শয়তান তাকে বলল, 'মেয়েটা তার দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আসছে প্লেট নেয়ার জন্য, কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে। তোমার উচিত প্লেটটা তার ঘরে গিয়ে দিয়ে আসা'। শয়তান কিনা তাকে বলছে আরো ভাল কাজ করতে! তাই সে খাবারের প্লেটটা ঘরে রাখা আরম্ভ করল। সেখানে রেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। এভাবে আরো কিছুদিন পার হলো। আর ওদিকে জিহাদ চলতে থাকায় ভাইদের ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। শয়তান আবারো তার কাছে এসে, বলল, 'আচ্ছা, তুমি তাকে এভাবে একা ছেড়ে দিবে, কেউ তো নেই যে তার দিকে একটু খেয়াল রাখবে; একটু কথা তো বলবে! সে যেন জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে আছে, কথা বলার কেউ নেই। তুমি কেন ওর দায়িত্ব নিচ্ছ না? ওর সাথে একটু সামাজিকতা বজায় রেখে তো চলতে পার। যেয়ে একটু কথা বলো যাতে করে তুমি তার খোঁজ-খবর রাখতে পারো। তা না হলে দেখা যাবে সে বাইরে যেয়ে কোন পরপুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে'। তাই সে মেয়েটির সাথে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল। মেয়েটা ঘরের মধ্যে থেকেই কথা বলত। দুজনকে প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হতো যেন তারা একজন অন্য জনকে শুনতে পায়।

শয়তান এবার তাকে বলল, 'তুমি এরকম দূর থেকে চেচামেচি না করে কেন ব্যাপারটাকে নিজের জন্য আরেকটু সুবিধাজনক করে নিচ্ছনা? কেন তার সাথে একই ঘরে বসে কথা বলছ না?' তো এবার সে মেয়েটার সাথে একই ঘরে বসে কিছু সময় ব্যয় করতে শুরু করল। তারপর ধীরে ধীরে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসাথে কাটাতে লাগল। আর আস্তে আস্তে তারা পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসতে লাগল। এক সময় এমন হল যখন সেই আবেদ, ধর্মযাজক, উপাসক সেই মেয়ের সাথে যিনায় (ব্যভিচার) লিপ্ত হল। ফলে মেয়েটা অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়ল।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। মেয়েটি একটি সন্তানের জন্ম দিল। শয়তান ধর্মযাজকের কাছে এসে বলল, ‘একি করেছ তুমি! তুমি কি জানো যখন ওর ভাইরা ফিরে আসবে তখন কী হবে? তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। এমনকি তুমি যদি এটাও বলো যে ‘এটা আমার বাচ্চা না’। তারা তোমাকে বলবে, তোমার বাচ্চা না হলেও তুমি তার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলে, তাই এটা এখন তোমারই দায়ভার। বাচ্চার বাবা কে আমরা তার পরোয়া করি না, তুমিই এর জন্য দায়ী’। সুতরাং এখন একটাই উপায়, তুমি বাচ্চাটাকে মেরে তাকে পুঁতে ফেল’। পরক্ষণেই সে ভাবল ‘এটা কি গোপন থাকবে? শয়তান বলল, ‘তোমার কি মনে হয় মেয়েটা এটা গোপনে রাখবে? তুমি যদি এরকম ভাব, তাহলে তুমি মস্ত বড় বোকা’। ‘তাহলে আমি কী করব?’। -‘তোমার ঐ মেয়েটাকেও মেরে ফেলা উচিত’। অবশেষে সে মেয়েটাকে আর বাচ্চাকে মেরে ফেলল, এরপর দুজনকে একই ঘরের নিচে কবর দিয়ে দিল।

মেয়েটির ভাইয়েরা একসময় ফিরে আসল। তারপর জানতে চাইল, ‘আমাদের বোন কোথায়?’, সে উত্তরে বলল, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর মারা যায়, তাকে ওখানে কবর দেয়া হয়েছে- এই বলে সে মনগড়া একটা কবর দেখিয়ে দিল তাদেরকে। তারা ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ বলল, তারপর বোনের জন্য দু’আ করল, আর নিজেদের বাড়ী ফিরে গেল।

রাতের বেলা এক ভাই একটা স্বপ্ন দেখল। কে তার সেই স্বপ্নে এসেছিল? শয়তান, সে তাকে বলল, ‘তুমি বারসিসাকে বিশ্বাস করো? তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো? সে মিথ্যা বলেছে। সে তোমার বোনের সাথে ব্যাভিচার করেছে, তারপর তাকে আর তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আর এই কথার প্রমাণ হল সে তোমাদেরকে যে কবর দেখিয়েছে তোমাদের বোন সেখানে নেই, আছে তার ঘরের পাথরের নিচে’। তার ঘুম ভেঙ্গে গেল আর সে তার ভাইদেরকে স্বপ্নের কথা জানাল। তারা বলল, ‘আমরাও তো একই স্বপ্নই দেখেছি। তাহলে এটা নিশ্চিত। পরদিন তারা সেই কবরটা খুঁড়ল; কিন্তু কিছুই পেল না। এরপর তারা তাদের বোনের ঘরে যেয়ে মাটি সরাল তখন দেখতে পেল তার বোনের মৃতদেহ সাথে একটা শিশু। তারা গিয়ে বারসিসাকে বলল, ‘মিথ্যুক! এইসব করেছ তুমি?’ তারা তাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। এমন সময় শয়তান আসল বারসিসার কাছে। এবারে কিন্তু সে মনের ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসেনি, সে আসল মানুষের রূপ ধরে। তাকে বলল, ‘বারসিসা, তুমি কি জানো আমি কে? আমি শয়তান, আমিই সে, যে তোমাকে এতো ঝামেলার মধ্যে ফেলেছি। আর আমিই সে একজন, যে তোমাকে এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারব। আমিই এসব ঘটনা ঘটিয়েছি আর আমার কাছেই আছে এসবের সমাধান। এখন তোমার উপর নির্ভর করে, তুমি যদি মরতে চাও তো ঠিক আছে। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে রক্ষা করি, তাহলে আমি করতে পারি’। বারসিসা বলল, ‘দয়া করে আমাকে বাঁচাও’। শয়তান বলল, ‘আমাকে সিজদাহ করো’। বারসিসা শয়তানের প্রতি সিজদাহ করল; কিন্তু শয়তান কী বলল? সে বলল, ‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল’ এরপর সে তাকে আর কোন দিন দেখতে পেল না।

বারসিসা শয়তানের উদ্দেশ্যে যে সিজদাহ করেছিল এটাই ছিল তার জীবনে করা শেষ কাজ। কারণ এর কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সুতরাং তার জীবনের শেষ কাজটা তাহলে ছিল- শয়তানকে সিজদাহ করা। সে ছিল সেই উপাসক যে ছিল সরল পথের উপর; কিন্তু যেহেতু সে সেপথ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যদিও প্রথমদিকে সেটাকে একেবারেই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। একটু সুবিধার নামে, দীনের মাসলাহার নামেই সে এগুলো করেছিল। সরল পথ থেকে তার বিচ্যুতির পরিমাপটা ছিল একদমই নগণ্য। কিন্তু দেখুন তার শেষ পরিণতি! নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করার বিপত্তিটা এখানেই। আমরা আমাদের ইবাদত ইত্যাদি নিয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে যাই। সুবহান আল্লাহ! আমাদের তো সব সময় উচিত নিজেদের নিয়ে শঙ্কায় থাকা, আমরা কখনই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হব না, বরং আমাদের সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, আর এটাই হল আল্লাহ-ভীতি, এটাই সত্যিকার অর্থে ‘জ্ঞান’। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে’।  
-ফাতির ৩৫:২৮

আসুন এবার আমরা দেখি বারসিসার এই কাহিনীতে আমাদের জন্য কী কী রয়েছে-

১. ইমাম আওলাকি রহ. তার ‘পরকাল’ সিরিজে মৃত্যু ফেৎনার কথা বলতে গিয়ে এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। খেয়াল করে দেখুন শয়তান বারসিসার সাথে কোন নীতি গ্রহণ করেছিল? যদি শয়তান বারসিসার কাছে এসে সরাসরি বলত, ‘আমাকে সিজদাহ করো’ বারসিসা কি কখনো তা করত? না, করত না। শয়তান ‘ধাপে ধাপে’ মানুষকে দীন থেকে বিমুখ করার নীতি গ্রহণ করে। শয়তানের কাজই হল সে সারা জীবন মানুষের পেছনে লেগে থাকবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ঈমান থেকে বিচ্যুত করে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত করার জন্য। বারসিসার করুণ পরিণতি থেকে আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি! এখানে ইমাম আহমদ রহ. মৃত্যুর সময়টার কথা বলা যেতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, তার পিতা যখন অবচেতন পর্যায়ে পৌঁছে যান আর বলতে থাকেন, ‘লা বা’আদ, লা বা’আদ’ ‘না এখনও নয়, না এখনও নয়’। একথা শুনে আব্দুল্লাহ চিন্তায় পড়ে যান। আপনি যদি আপনার বাবাকে তার মৃত্যুমুহুর্তে বলতে শুনেন, ‘না এখনও না, না এখনও না’, আপনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন? এটার অর্থ কী বলে আপনার কাছে মনে হবে? ‘না এখনও না, আমি এখনও মরতে চাইনা’ এমনই মনে হওয়ার কথা, তাই না?

তো ইমাম আহমদ রহ. জেগে উঠলে, আব্দুল্লাহ উদ্বিগ্ন হয়ে পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আমার পিতা, কেন আপনি বলছিলেন ‘এখনও না, এখনও না?’ ইমাম আহমদ বললেন, ‘শয়তান আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তার অঙ্গুলি কামড়ে বলছিল, ‘হে আহমদ, তুমিতো আমার হাত ফসকে বের হয়ে গেলে, হে আহমদ, তুমি তো আমার হাত ফসকে বের হয়ে গেলে!’ তাই আমি তাকে বলছিলাম, ‘না, এখনও না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মারা যাচ্ছি। তোমার আর আমার যুদ্ধ এখনও চলছে। যখন আমি মারা যাব, একমাত্র তখনই আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পাব।’



ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, ‘এরকম হওয়ার কারণটা হলো এই যে, শয়তান বুঝতে পারে আপনার সাথে এটাই তার শেষ সুযোগ, যদি এবার আপনি তার হাত থেকে ছুটে যান তো আপনি চিরকালের জন্যই তার কাছ থেকে পার পেয়ে গেলেন। শেষ সময়ে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারার অর্থ সে আপনাকে আর ধরতে পারল না। এজন্যই শয়তান আপনার জীবনের শেষ সময়ের দিকে বিশেষ নজর দেয় আর আপনার বিরুদ্ধে তার কাজকে আরো জোরদার করে তুলে।’ সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদের উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন যে, শয়তান আমাদের পেছনে কী পরিমাণ পরিশ্রম করে যাচ্ছে শুধু আমাদের পথভ্রষ্ট করে মৃত্যুমুখে পতিত করার জন্য। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন, আমীন।

২. খালি চোখে বারসিসার কাহিনী থেকে যে শিক্ষাটা আমাদের প্রথমে মনে আসে সেটা হল ‘নারী ফেৎনা’। নারী ফেৎনার প্রকটতা বুঝতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কেন রাসূল সা. বলে গেছেন, ‘আমি আমার উম্মতের জন্য নারীর চেয়ে অধিক বড় কোন ফেৎনা রেখে যাচ্ছি না’। রাসূল সা. বলেছেন, ‘যখন দুইজন নারী-পুরুষ একাকী অবস্থান করে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শয়তান অবস্থান করে’। শুধু তাই নয় স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (নারীদের প্রতি)’। -সূরা নিসাঃ ২৮। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা থেকে যেসব বিষয় মানুষকে বিরত রাখে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, ‘মানবকূলকে মোহ গ্রস্ত করেছে নারী...’। -সূরা আলে ইমরানঃ ১৪

সুবাহানাল্লাহ! আমরা যারা নিজেদের ইসলামপন্থী বলে পরিচয় দিই, ইসলামের খাতিরে ফেসবুক, ব্লগ কিংবা ভাটুয়াল জগতে বিচরণ করি, খুবই দুঃখজনক সত্যি এই যে, নারী ফেৎনার এই হাদিস আর কুরআনের আয়াতগুলো কখনো আমাদের মনে থাকেনা, কিংবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা জানিই না! দেদারছে ছেলে মেয়ে মাখামাখি, হাসি তামাশা, রসালো কমেন্ট বিনিময় করেই যাচ্ছি। নেট জগত বলে কি নন মাহরাম আপনার জন্য মাহরাম হয়ে গেল? নাকি নিজেকে সব ফিতনা থেকে নিরাপদ ভাবেন? নাকি জান্নাতের টিকেট পকেটে নিয়ে ঘুরছেন? আল্লাহ্ আকবর! মৃত্যু খুব নিকটেই ভাই, খুব নিকটেই! নিজের ঈমান নিয়ে সচেতন হন। এত এত ইসলামিক জ্ঞান, দাওয়া, ইবাদত নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেন বারসিসার মত করে মরতে না হয়! আল্লাহ রহম করুন।

৩. সর্বশেষ একটা শিক্ষা আমরা বারসিসার কাহিনী থেকে নিতে পারি সেটা হল- বৈরাগ্য বা একাকিত্বের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে। একটু চিন্তা করুন মেয়েটি যদি বারসিসার স্ত্রী হত, কিংবা বারসিসার যদি পরিবার থাকত তাহলে হয়ত শয়তান এত সুযোগ পেত না তাকে পথভ্রষ্ট করার। একটি কথা আমার খুব ভাল লাগে- আপনি একা থাকলে যা করেন সেটাই আপনার চরিত্র! একাকিত্ব শয়তানকে খুব বেশী সুযোগ করে দেয় তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার। যে কারণে দীনের পথে থাকতে চাওয়া ভাই বোনদের সবসময় একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা উচিত। বারসিসার ক্ষেত্রে শয়তান এই সুযোগটা নিয়েছিল! তাকে

ওয়াসওয়াসা দিয়েছিল যা বারসিসা এড়িয়ে চলতে পারেনি। একাকিত্বের সময়ের শয়তানী ওয়াসওয়াসা মানুষের তাকুওয়ার লেভেলকেও নিচে নামিয়ে দেয় খুব সহজে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের উপর রহম করুন।

বারসিসার যে কাহিনীটা বর্ণনা করলাম এটা হয়ত অনেকেই জানেন। কিন্তু হয়ত এভাবে ভেবে দেখেননি। এখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাটুকু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশগুলোকে পবিত্র করার কাজে লাগতে পারে ইনশাআল্লাহ। ভুলকে মেনে নিয়ে তার জন্য অনুতপ্ত হয় মানুষ আর ভুলের উপর অবিচল থেকে তার জন্য অজুহাত দেখায় শয়তান। আমরা আশরাফুল মাখলুকাত। আমরা আমাদের ভুলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। এই লেখায় উপলব্ধি করার মত কিছু থাকলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তা উপলব্ধি করার তৌফিক দেন। আমাদের পাণ্ডুলো যেন মুছে দেন। বিগত দিনের ভুলগুলো যেন আজকের দিনের শুদ্ধতার অনুপ্রেরণা হয়। ইসলামের শিক্ষা আর উপলব্ধি যেন আমাদের জান্নাতের পথের পথিক হতে সাহায্য করে। শয়তান যেন দুর্ভাগা বারসিসার মত আমাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের কঠিন আগুনে নিয়ে না যায়। আমীন।

## কুড়ানো মানিক

রাসূল সা. কে অবমাননা করা যদি হয় তোমাদের  
বাক-স্বাধীনতার অংশ, তাহলে তোমাদের হত্যা  
করাও আমাদের দ্বীনের অংশ

শহীদ ইমাম আনওয়ার আল আওলাকী রহ.



# নাস্তিকরা কেন রাসূল সা. কে অপছন্দ করে ?

-যুবায়ের হুসাইন

যারা বলে, ইসলামবিদ্বেষীদের কাছে আমরা ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারিনি বিধায় তারা ধর্মবিদ্বেষী হয়েছে, তারা ভুল বলে। ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকরা এই মুসলিমদের চেয়ে কুরআন বেশি পড়েছে, সীরাত বেশি জেনেছে (হোক নিজেদের মনমত করে বুঝেছে, কিন্তু অন্তত জেনেছে তো)। আমাদের শতকরা ৯৮ ভাগ মুসলিম সূরা তাওবাতে কী আছে জানেনা, সূরা মুহাম্মাদে কী আছে জানেন না। মুক্তমনার নাস্তিকেরা জানে। বনু কুরায়জার ইহুদীদের হত্যার ঘটনা আমাদের মুসলিমরা জানে না, মুক্তমনার নাস্তিকেরা জানে। আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে সাহিত্য রচনার অপরাধে কা'ব বিন আশরাফ, আবু রাফেদের হত্যার ঘটনা আমাদের মুসলিমরা জানে না, মুক্তমনার নাস্তিকেরা জানে।

এক শ্রেণীর দাঈ সবকাজে মুসলিমদের অভিযুক্ত করে অভ্যস্ত। তাঁরা মনে করেন, নাস্তিকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে বলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ করে, এর জন্য নাকি মুসলিমরাই দায়ী। মুসলিমরাই নাকি খারাপ কাজে যুক্ত হওয়ায় ইসলামের বদনাম হচ্ছে। কারণ নাস্তিকেরা বর্তমান মুসলিমদের মাধ্যমেই ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করে।

মজার ব্যাপার হল, আপনি যদি লক্ষ করেন নাস্তিকেরা কী ধরণের টপিক নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে ব্যঙ্গ করে, দেখবেন সেগুলো এমন কিছু আহকাম যার ওপর মুসলিমরা আমল করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তারা বলে, আল্লাহর রাসূল জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করেছেন। অথচ মুসলিমরা এখন জিহাদ প্রায় পরিত্যাগ করেছে। তারা ইসলামের বহুবিবাহ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, অথচ বর্তমান মুসলিমরা বহুবিবাহের কথা শুনলে দ্রুত কুণ্ঠিত করে। নাস্তিকেরা ইসলামের শরীয়াহ আইনের চোরের শাস্তি, জেনার শাস্তি নিয়ে কটাক্ষ করে, অথচ বর্তমান মুসলিমরা শরীয়াহ আইন থেকে দূরে সরে গেছে।

তার মানে কী দাঁড়াল? তার মানে দাঁড়াল- এদের ইসলামবিদ্বেষের কারণ ইসলাম, কোন মুসলিম না; বরং বর্তমানের মুসলিমরা দীন থেকে সরে যাওয়ায় এরা খুশিই হচ্ছে। এদেশে মানুষের নাস্তিক হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল- বিকৃত যৌনতাকে অনুমোদন দেওয়া। সমকামিতা তো শিশুতুল্য, নাস্তিকরা আপন ভাই-বোনের সেক্সকে পর্যন্ত স্বাভাবিক মনে করে। হুমায়ুন আজাদ বলেছিল, তার নিজের মেয়েকে দেখলে তার কামনা জাগে। দেশের চটিসাইট, পর্ন ইন্ডাস্ট্রিসহ সকল নষ্টামির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা নাস্তিকেরাই কিন্তু আবার আল্লাহর রাসূলের বহুবিবাহকে বলে বিকৃত যৌনতা!

তারা প্রশ্ন করে, ইসলাম কেন দাসীর সাথে যৌনতাকে হালাল করেছে। আচ্ছা, ধরলাম ইসলামে দাসপ্রথা নেই, তাহলে কি তারা ইসলাম গ্রহণ করবে? না, তারা বলবে জিহাদের নামে রক্তপাত কেন? আচ্ছা, যদি জিহাদটাও ইসলামে না থাকত, তবে কি এরা মুসলিম হয়ে যেত? না, কারণ তারা তো সালাত, সিয়াম এগুলোকেও অনর্থক মনে করে।

সুতরাং তারা ইসলামটাকে চাচ্ছে নিজেদের মত করে। আপনি যদি দীন ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে যান তবে আপনার সাতখুন মাফ, কিন্তু দীনে থাকা পর্যন্ত এরা আপনাকে শত্রু হিসেবেই দেখবে। আপনি নাস্তিক হয়ে একশটা মেয়ের সাথে রাত কাটান, কুকুরের মত রাস্তায় ঘোরেন- সেটাকে তারা বলবে, ‘স্বাধীনতা’ কিন্তু মুসলিম হয়ে দুইটা বিয়ে করবেন, তো আপনার চেয়ে অসচ্চরিত্র কেউ তাদের কাছে দুনিয়ায় নেই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপরাধ তিনি একজন মুসলিম, তিনি ইসলাম পুরোপুরি পালন করেছেন। তাঁর অপরাধ তিনি মুরতাদদের কতল করতে বলেছেন। তাঁর অপরাধ তিনি বিকৃত কামনাকে কবর দিয়েছেন, বিকৃত কামুকদের পাথর মেরেছেন। তাঁর অপরাধ তিনি এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছেন, নাস্তিক-মুরতাদদের ‘মুক্তমন’কে পিষে ফেলেছেন।

কীভাবে? আসুন সেই মহামানবের মুখেই শোনা যাক: ‘আমাকে কিয়ামতের পূর্বে তরবারিসহ প্রেরণ করা হয়েছে যেন এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়।’ -মুসনাদে আহমদ ৪৮৬৯

নাস্তিকেরা কেন আল্লাহর রাসূলকে দেখতে পারেনা, এবার বোঝা গেল কি?



# মুসলিম উম্মাহর হীনমন্যতা ও দুর্বলতা: কারণ ও উত্তোরণের উপায়

কারী আব্দুল হাদী

বর্তমান সমাজে মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদের ভীতি প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাদের মোকাবেলা করার মত সাহস ও আগ্রহ কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। মুসলমানদের কাজে কর্মে ও তাদের দৈনন্দিন জীবনচারে তার চিত্র একেবারেই স্পষ্ট। মুসলমানদের স্বভাবগত চরিত্র তো ছিল, তারা বীর-বাহাদুর-পলোয়ান জাতি; কিন্তু আজ তাদের মাঝেই পরিলক্ষিত হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত দিকটি। তার কারণ কী? নিম্নে এর কিছু মৌলিক কারণ ও এর থেকে উত্তোরণের উপায়-

**প্রথম কারণ:** মুসলমানদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার শক্তি, কুদরাত ও মাহতুয়ের প্রতি আস্থা মুছে গেছে। এটিই মূলত আমাদের হীনোবলের সবচেয়ে বড় এবং মৌলিক কারণ। আল্লাহর মাহতু্যকে যেভাবে আমাদের অন্তরে স্থাপন করার কথা ছিল সেভাবে আমরা স্থাপন করিনি বা করতে পারিনি। ভুলে বসেছি আল্লাহর ভালবাসা ও কুদরতের ব্যাপ্তির কথা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।’-যুমার: ৬৭

আল্লাহ তাআলার সম্মানও মাহতু্য কেয়ামতের দিন এভাবে প্রকাশ পাবে যে, সেদিন আসমান জমীন তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে। আমরা যদি এ দুনিয়ায়ও তাঁর আখেরাতের সেই মহাশক্তির পরিচয়টা লাভ করতে পারি এবং তাঁর যথাযথ মাহতু্য আমাদের অন্তরে স্থাপন করে নিতে পারি তাহলে আমাদের অন্তরে কাফেরদের ভীতি ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার চিকিৎসা এমনিতেই হয়ে যাবে। এটা তো কখনই সম্ভব নয় যে, যে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে সে অন্তরে আবার কাফেরদের ভয়ও বিরাজ করবে। একারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার ভয় দিয়ে অন্যদের ভয় নিভৃত্তির চিকিৎসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ- যদি তোমরা মুমিন হও।’- তাওবা: ১৩

অন্যত্র বলেন, ‘অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না আমাকে ভয় কর আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো

না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাড়াই কাফের।’ মায়োদাহ-৪৪ এভাবে আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার ভয় দিয়ে আমাদের অন্তর অন্যের ভয় থেকে মুক্ত করার চিকিৎসা করেছেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর কাফেরদের ভীতি প্রভাব বিস্তারের কারণও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এরাই হল শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।’-আলে ইমরান: ১৭৫ অতএব আজ যারা নিজেদের কথা বা কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে কাফেরদের ভয় ও প্রভাব বিস্তারে জেনে বা না জেনেই অংশগ্রহণ করছে তারা কাদের তল্লাবাহীর কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে তা একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এ ভূপৃষ্ঠের আধিপত্য তাদেরকেই দান করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।’-ইব্রাহীম: ১৩-১৪

যখন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান পাকা হয়ে যায় এবং তাঁর ভয় অন্তরে প্রোথিত হয়ে যায় তখন তার প্রতিটি কথায় এবং কাজে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ পায়। কোরআনে আল্লাহ তাআলা এর অনেক নমুনা আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম আ. এর সাথে না ছিল কোন সৈন্য বাহিনী আর না ছিল কোন সামরিক ব্যবস্থাপনা। কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে শত্রুদলের সাথে এমন নির্ভয়ে কথা বলেছেন যার প্রতিটি শব্দ আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত ও তাঁর প্রতি চরম ভীতির বার্তা বহন করে।

এর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা এভাবে দিয়েছেন, ‘তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না, তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্থায়ী জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? যাদেরকে তোমরা

আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় করব, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক। যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।’ আনআম: ৮০-৮২

অন্য এক জায়গায় ইব্রাহীম আ. কাফেরদেরকে হুমকি দিয়েছেন যে, ‘আল্লাহর কসম! যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।’-আম্বিয়া: ৫৭

আর এটা তিনি বাস্তবেও করে দেখিয়েছেন, ‘অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত, যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।’ আম্বিয়া-৫৮

অতঃপর যখন তাঁকে তাদের মূর্তি ভাঙ্গার দায়ে শাস্তির মুখোমুখি করা হল তখনও তিনি নির্ভয়ে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর, ওদের। তোমরা কি বোঝ না?’- আম্বিয়া: ৬৬-৬৭

এমনই বীরত্ব আমরা দেখতে পাই হযরত মুসা আ. এর যাদুকরদের ব্যাপারে। যারা তাঁর মো’জেযা দেখেই আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছিল। অতঃপর তারা ফেরাউনের কোন পদক্ষেপকেই ভয় করেনি। ফেরাউন তাদেরকে অনেকভাবে ভয় দেখিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, তোমাদের হাত-পা কেটে দিব। তোমাদেরকে শূলে চড়াব। তখন তারা বলেছিল, আমাদের কাছে যে প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে তার চেয়ে তোমাকে আমরা প্রাধান্য দিতে পারব না। তোমার যা ইচ্ছে কর।

এটা ছিল একমাত্র ঈমানের বল। যা তাদের অন্তরে স্থান গড়ে নেওয়া মাত্রই তাদের কথায় ও কাজে এমনভাবে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল, যার কল্পনাও হয়ত আমরা করতে পারব না।

অনুরূপ হযরত নূহ আ. এর সাথেও মুষ্টিমেয় লোক ছিল, যাদের জন্য একটি নৌকাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের সংখ্যাশুল্লতার কোন পরোয়া না করেই নির্ভয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তা নিয়মিত অবাক করার মতই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তাদেরকে গুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের মাঝে আমার উপস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না।’-ইউনুস: ৭১

রাসূল স. কেও আল্লাহ তাআলা নিজের কওমের প্রতি ঘোষণা দিতে বললেন যে, ‘আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমার সহায় হলেন আল্লাহ, যিনি

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। আল-আ’রাফ ১৯৫-১৯৭

মোট কথা হল, যখন আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে বসে যায় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ভয় অন্তর থেকে বিদায় নেয় তখন একজন ঈমানদার শত দুর্বলতা সত্ত্বেও বড় বড় শক্তিকে সে ভয় পায় না। বড় বড় শক্তিশালী অধিপত্যের চেয়েও বড় অধিপতি হয়ে যায়। ফলে একজন মুমিন এত অসহায় হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তাদের শত নিরাপত্তা, মজবুত ঘাটি এবং শত পহারাদারীর মাঝে থেকেও উক্ত মুমিনকে ভয় করতে থাকে।

আজ আমাদের কাপুরুষতা ও অন্তরের রোগ এবং দীন-দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার মূলেই হল আমরা আল্লাহ তাআলার ভয় যেভাবে আমাদের অন্তরে স্থাপন করা আবশ্যিক ছিল তা আমরা করিনি। আজও যদি আমরা এই একীর্ণ অর্জন করতে পারি যে, আল্লাহ সবকিছুর উপরই শক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাঁর সীমাহীন শক্তির সামনে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এমনকি গোটা পৃথিবীর ঐক্যশক্তিও মশার পাখার চেয়ে বেশি কোন উল্লেখযোগ্য শক্তি নয়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বিদ্রোহগতির বিমান, সুবিশাল নৌজাহাজ, ড্রোন বিমান, ডেইজি কাটার, টমাহক মিসাইল, সুশৃঙ্খল সৈন্য বাহিনী আর বড় বড় শক্তির দাবিদাররা তার ‘কুন’ নির্দেশের সামনে এক মুহূর্তও টিকে থাকার নয়।

তাহলে নিঃসন্দেহে এমন ঈমানের জন্যই আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আজও সেই সুন্নতের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন যার আলোচনা কোরআনে আল্লাহ পাক এভাবে দিয়েছেন, ‘ভূপৃষ্ঠে যাদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা বানানোর এবং তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী করার।’- কাসাস: ৫

**দ্বিতীয় কারণ:** আমরা কাফেরদের শক্তিকে অপরাজেয় শক্তি বলে ভেবে নিয়েছি। কাফেরদের এজেন্ট, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখক; তাদের প্রচারণা-প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং এ ধরনের যত প্রচার-মাধ্যম আছে তার মাধ্যমে কাফেররা আমাদেরকে একটি কথা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, ‘আমরা সীমাহীন শক্তির অধিকারী। আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে এমন কেন শক্তি নেই। অতএব আমাদের সাথে মোকাবেলা করার চিন্তাও যেন কেউ না করে।’

শুধু এই একটি কথা রটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্লীম তৈরি করা হচ্ছে। বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে। সংবাদপত্র, বুলেটিন ইত্যাদিতে কলাম, মন্তব্য, নাটক ইত্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। তাদের এই প্রচারণা সর্বত্র চলছে ব্যাপক হারে। অবশেষে আমাদের অন্তরে গেঁথেছে যে তারা পরাশক্তি। আর পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে, আমাদের কাজে কর্মেও কাফেরদের উক্ত কথার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি আমরা তেমনই বলতে বসেছি যেমন তালুতের বাহিনীরা বলেছিল। তারা বলেছিল, ‘জালুতের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই।’



কাফেরদের এই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই স্বশস্ত্র লড়াইয়ের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ, এ যুদ্ধে পরাজিত লোক তো ময়দানেই উপস্থিত হয় না যে, তারা কাফেরদের জন্য ভয়ের কারণ হবে। ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশকে কাফেররা ভীতসন্ত্রস্ত করে পিছনে ফেলে দেয়। নিবেদিতপ্রাণ গুটিকতক মুসলমান এবং জান মাল দিয়ে তাদেরকে সহয়তাকারী মুসলমানই তাদের উক্ত প্রোপাগান্ডা থেকে রেহাই পেতে পারে। যারা তাদের ঈমানী চেতনার মাধ্যমে কুফরের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম যারা নিজেদের জান মাল কোরবানী করে উক্ত মিথ্যাপ্রভুত্বের দাবীদারদের অসহায়ত্ব দুনিয়ার লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দেয় এবং বর্তমান কালের সেই শাসনের নামে রবের আসনে বসা মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। কাফেরদের মহাশক্তির অহংকার সেই নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন নামক ঘাঁটি ১১ই সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৯জন মুজাহিদ ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। তাদের আধুনিক টেকনোলজি এবং সিকিউরিটি কোন কাজেই আসেনি। এমনকি তাদেরই বিমানবন্দর থেকে তাদেরই বিমানে আরোহন করে তাদের চারটি বিমান লাপাত্তা করে তাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা যে পরাশক্তির দাবী কর তা একান্তই মিথ্যা।

এভাবে আরও অনেক হামলা মুসলমানরা করেছে যেখানে অনুপ্রবেশ করা তাদের কথায় অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল উক্ত ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে আজও মুসলমানরা এ বিষয়ে দ্বন্দে রয়েছে যে, সে হামলা কারা করেছিল? কারণ, তাদের এ বিশ্বাস অনড় হয়ে আছে যে, আমেরিকার উপর এ হামলা করতে পারে এমন কোন ইসলামী শক্তি পৃথিবীতে নেই। এমন অজ্ঞতার উপর শত ধিক।

**কাফেরদের এহেন প্রোপাগান্ডা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিম্নে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হল-**

**প্রথমত:** কাফেরদের দেওয়া কোন খবরের উপর ভরসা করা চলবে না এবং তাদের কোন আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাবে না। বিশেষত, তারা তাদের বিজয় এবং মুসলমানদের কোন পরাজয়ের খবর প্রচার করলে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যাবে না। তাদের এ ধরনের খবর অপরকে বলার তো অবকাশই নেই। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক লোক কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে।’ আল হুজুরাত-৬

শরীয়ত যদি কোন ফাসেকের খবরের উপর ভরসা করতে নিষেধ করে থাকে তাহলে কাফেরদের খবরের উপর বিশ্বাস করার অবকাশ কোথায়? বিশেষ করে আমাদের যখন এটা জানা আছে যে, ‘বিশ্ব মিডিয়াশক্তি’ আমাদের চির দুশমন ইহুদী নাসারাদের হাতে। এমন মিডিয়ার উপর কোন বিবেকবান মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের খবর অন্যকে বলা তো আরও ভয়ংকর।

ইমাম মুসলিম রহ. ‘যা শুনবে তাই বলা নিষেধ’ শিরোনামে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যা শুনবে তা বলাই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতএব আমাদের জন্য উচিত হল আমরা না তাদের খবর-সংবাদকে বিশ্বাস করব আর না তাদের সংবাদ মুসলমানদের মাঝে প্রচার করে মুসলমানদের সাহস হারানোর কাজে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা ও নৈরাজ্যের সুযোগ করে দিব।

**দ্বিতীয়ত:** কাফেরদের প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত কোন বিবৃতি বা মন্তব্য শুনা যাবে না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটা আবশ্যিক যে তারা কাফেরদের কোন প্রচারমাধ্যমের কোন সংবাদ, বিবৃতি বা কোন মন্তব্য শুনবে না। তবে শরীয়তের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী কেউ কাফেরদের প্রোপাগান্ডা চিহ্নিত করার জন্য শরীয়তের নিয়মের অধীনে থেকে পড়তে, শুনতে বা দেখতে পারে। মুজাহিদ্দীনদের দায়িত্বশীলরাও শুনবেন; কিন্তু যারা সাধারণ জনতা বা যাদের শরীয়ত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তাদের শুধু জানার জন্য শুনা অনুচিত; চাই সে দুনিয়াবী কোন বিষয়ের বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন।

**তৃতীয়ত:** মুজাহিদ্দীনদের প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে আস্থার সাথে বাস্তবতা উপলব্ধি করে কাফেরদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা। যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন কাফেরদেরকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছেন, আমেরিকা নামক সুপার পাওয়ারের দাবিদার শক্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছেন, নিরাশ হতাশ মুসলমানদের বুকে আশার আলো জ্বালাচ্ছেন, তাদের পরিবেশিত সংবাদকেই আস্থায় নিতে হবে। তারা যে সংবাদ আমাদেরকে দিবেন আমরা সেই সংবাদকেই বিশ্বাস করব। এমনকি যারা ময়দান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে কিন্তু কাফেরদের দেওয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মন্তব্য করছে তাদের কথায়ও কর্পপাত করা যাবে না। ইসলামী শরীয়তে আমাদেরকে সেই সংবাদই বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, যে সংবাদ এমন কোন আলেম প্রচার করেন যিনি ইসলামী আইনের ব্যাপারে যেমন অভিজ্ঞ মাঠপর্যায়ে ঘটিত অবস্থার ব্যাপারেও তেমন অভিজ্ঞ। এ উভয় অভিজ্ঞতা কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই কেবল তার কথা বিশ্বাস করতে হবে। কারণ, কেউ যদি আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞও হয় কিন্তু মাঠ পর্যায়ে ঘটিত বিষয়ের কোন জ্ঞান তার না থাকে তাহলে তার দেওয়া মন্তব্য অন্তসার গুণ্য হতে বাধ্য।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, জিহাদের ব্যাপারে এমন আলেমদের থেকেই পথনির্দেশ নিতে হবে যিনি স্বশরীরে ময়দানে উপস্থিত। কারণ ময়দান থেকে দূরে অবস্থিত ব্যক্তি ময়দানে সজ্জাচিত বিষয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন মুজাহিদ্দীনদের ব্যাপারে কোন পথনির্দেশ দিতে সক্ষম নয়। যদিও তিনি অনেক দীনদার ও মোখলেস হয়ে থাকেন। তাই কর্তব্য হল, জিহাদ ও মুজাহিদ্দীনদের ব্যাপারে এবং কাফেরদের দুর্বলতার ব্যাপারে বাস্তব সংবাদের জন্য জিহাদের ময়দানে উপস্থিত মুজাহিদ্দীনদের দেওয়া সংবাদের উপর ভরসা করা। অন্য কোন মাধ্যমে পাওয়া সংবাদের উপর বিশ্বাস করার পরিবর্তে মুজাহিদ্দীনদের থেকে পাওয়া সংবাদের জন্য অপেক্ষা করা।

**তৃতীয় কারণ:** আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম ‘সংখ্যাধিক্যের উপর অল্পরাই বিজয় লাভ করে’ এ কথার আস্থা হারিয়ে ফেলা। ইতিহাসের সাধারণ কোন ছাত্রের কাছেও একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন সুপার পাওয়ার এবং মহাশক্তির পতন ঘটাতে চান তার জন্য বিশাল কোন বাহিনী ময়দানে পাঠান না। বরং তার চেয়ে অনেক দুর্বল শক্তির বা সাধারণ কোন প্রাণীর মাধ্যমেই তার দম্ব চূর্ণ করেন। কখনও বা কোন জড় পদার্থের মাধ্যমেও সমাধা করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। বস্তুত; এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।’-ইয়াসীন: ২৮-২৯

ফেরাউনের বাহিনীর জন্য মূসা আ. এর লাঠিই যথেষ্ট ছিল। নমরুদের পরিণতি ঘটানোর জন্য কয়েকটি মশাই যথেষ্ট কাজ করেছিল। কারুনকে আল্লাহ তাআলা তার ধনভাণ্ডারসহ ধসিয়ে দিয়েছিলেন। আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর জন্য কিছু ছোট অসহায় পাখির নিক্ষেপ করা পাথর কনাই ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। লূত আ. এর কওমের সমাধা আসমান থেকে বর্ষিত পাথরই করে দিয়েছিল। মক্কার কাফেররা, রোম পারস্যের আধিপত্য মুষ্টিমেয় নিরস্ত্রপ্রায় সাহাবাদের হাতে চিরতরের জন্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় অগণিত আছে। নিকট অতীতেও আল্লাহ তাআলা তার এই নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছেন। ব্রিটিশের সেই সাম্রাজ্য যার পরিধিতে সূর্যাস্ত হত না, যার সামনে পৃথিবীর কোন বাহিনীই মোকাবেলা করার সাহস করত না তারা যখন আফগানিস্তানে এসে সেখানের বাসিন্দাদের উপর জুলুমের কালোহাত প্রসারিত করেছে তখন সেখানের কিছু সরল, অসহায় মুসলমান তাদেরকে এমন শিক্ষণীয় পরাজয়ের গ্লানি খাইয়ে দিলেন যে, তাদের সেই বিশাল বাহিনীর একজন লোক ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিল না। তাকেও আবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এজন্য যেন সে তার বাহিনীর চরম পরিণতি তার প্রভুদের কাছে বর্ণনা করতে পারে। তার পর আসলো রুশ সেনাদের সেই অপ্রতিরোধ্য শক্তি যাকে অপরাজেয় মনে করা হত, যার ভয়ে পুরো ইউরোপ কম্পমান ছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় এমন পরাজিত আফগানিস্তানের সামান্য অস্ত্রধারী দুর্বল মুসলমানদের হাতে এমনভাবে পরাজিত হল যে, ‘সোভিয়াত ইউনিয়ন’ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে গেছে। এর পর আফগানিস্তানের চলমান যুদ্ধে বলতে গেলে গোটা পৃথিবীর শক্তি মিলে আফগানিস্তানে এসেছিল মাত্র কয়েক দিনের জন্য। যা আজ চৌদ্দ বছর পার হওয়ার পর শিক্ষণীয় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর এ ধরণের বড় বড় শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শক্তির হাতে পরাজয়ের কারণ একাটাই। যখন দুর্বলদের কাছে ঈমানী শক্তি বিরাজ করে এবং তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য সংযুক্ত হয় তখন পার্থিব সম্রাটের সংকট তাদের কাছে বাধার কোন কারণ হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

(বহু অল্প সংখ্যালঘু দল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বহু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর বিজয় লাভ করেছে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে তার ভয়, শঙ্কা ও কাপুরুষতার পথ অবলম্বনের কোন কারণ থাকতে পারে না। তাই আমাদের সবাইকে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে পাকা পোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চাই।

**চতুর্থ কারণ:** সামরিক বিদ্যা ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীনতা এবং গেরিলা যুদ্ধের সফল কৌশলের ব্যাপারে অজ্ঞতা।

আমাদের পরাজয় ও কাপুরুষতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে- মুসলমানদের বৃহদাংশ বিশেষ করে যারা যোগ্য এবং মেধাবী তাদের অধিকাংশ সামরিক বিদ্যায় অনবিজ্ঞ এবং মুজাহিদদের চলমান রণকৌশল, বিশেষকরে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞতা। এই লোকগুলো যদি কিছু সময়ের জন্য ময়দানে গিয়ে মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের অভিযানের সফলতা এবং কাফেরদের চরম পরিণতি স্বচক্ষে দেখত তাহলে তাদের শত প্রশ্ন বড় কোন দলিল পেশ করা ছাড়াই অতি সহজে সমাধান হয়ে যেত। তাদের অন্তরে কাফেরদের প্রভাব এবং কাপুরুষতার চিহ্ন মাত্রও থাকত না। এটা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, সজ্জিত বড় কোন কিছু এলোমেলো করার জন্য কোন বড় শক্তির প্রয়োজন

হয় না। কাফেরদের বছর ধরে পরিশ্রমে তৈরি অগণিত সরাঞ্জামে পূর্ণ বিশাল কোন ভবন ধ্বংস করার জন্য তেমন বড় কোন ব্যাবস্থার প্রয়োজন হয় না। বরং কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সামান্য বারুদের উপযুক্ত ব্যবহারে তা ধুলিস্মাৎ করতে সক্ষম।

গেরিলা যুদ্ধের চিত্রটা যদি এভাবে আঁকা হয় যে, কাফেরদের কাছে মুসলমানদের অবস্থান অস্পষ্ট এবং এলোমেলো তাহলে কাফেররা মুসলমানদেরকে তাদের টার্গেটে পরিণত করতে সক্ষম হবে না। যার ফলে কাফেররা মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। অপরদিকে কাফেরদের শক্তি যত বেশিই হোক না কেন তাদের সেনা সৈন্য যত অধিকই হোক না কেন তাদেরকে টার্গেটের আওতায় আনা অনেক সহজ। বরং তাদের কাজ যত সজ্জিতরূপে থাকে তাদের পরিকল্পনার ফলাফল অতি সহজেই নির্ণয় করে তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়ে যায়। যার ফলে কাফেরদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। বিশেষত চলমান গেরিলা কৌশল (শহীদী আক্রমণ) সমস্ত মুজাহিদ্দীনরাই অবলম্বন করেছেন। মুজাহিদ্দীনরা কাফেরদের অঞ্চলে গিয়ে কাফেরদেরকে বিতাড়িত করার সহজ পদ্ধতি শহীদী আক্রমণের পথ অবলম্বন করেছেন। যার ফলে যুদ্ধের রূপটাই পাল্টে গেছে। যেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল কাফেরদের জন্য সেখানে ফল তার ঠিক বিপরীত। বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করেছে। কাফেররা তাদের এতসব আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র সত্ত্বেও অসহায়ত্বের চরমে পৌঁছেছে। আর মুসলমানদের সমরাস্ত্র অতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের কাছে এক ভীতির রূপ ধারণ করেছে।

এজন্য মুসলমানদের জন্য সমরাস্ত্র সংকটের ভয় না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের কাছে যা আছে তার যথাযথ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং যথাসম্ভব শক্তিসংগ্রহ করায় যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। অনেক সাহাবা এমন ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই জিহাদে অংশ নিয়েছেন। এমনকি কোন আমল করার পূর্বেই শহীদও হয়ে গেছেন। রাসূল স. এর কাছে তার কথা বলা হলে রাসূল স. বলেছেন, সে আমল কম করলেও তার আমলনামায় সওয়াব অনেক বেশিই জমা হয়েছে। একথা আমরা সবাই জানি যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয় অভিজ্ঞ না হয় তাহলে সে অন্যের কাছে সে বিষয়ে পরাজিত হতেই হয় এবং সে চায় যে তার কাছে কোন সময় যেন তেমন বিষয় উপস্থিত না হয়। ঠিক তদ্রূপ যখন কেউ সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ না হবে সে সমর বিদ্যায় বিজ্ঞের কাছে নিশ্চয়ই পরাজয় বরণ করবে আর সর্বদা তার এ চেষ্টা থাকবে যেন তার সামনে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন বিষয় যেন সামনে না আসে। এই পরাজয় এবং পলায়নের অভ্যাস দূর করার জন্য সমর বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া ছাড়া আর কী উপায় হতে পারে? তাই আমাদের সবার জন্য কর্তব্য হল নিজেদের কাপুরুষতা দূর করার জন্য এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করার জন্য সামরিক বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করা। রাসূল স. কোন কোন সাহাবীকে বহু দূরদেশেও সমর বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ আমাদের রাসূলের সেই সুন্নাতকে জিন্দা করার তাওফিক দান করুন।

সাহাবায়ে কেরাম কাপুরুষতাকে অত্যান্ত ঘৃণা করতেন। কোন কোন সাহাবা কাপুরুষতা দূর করার জন্য আল্লাহর রাসূল স. এর কাছে দোআও চেয়েছেন। আমরাও কাপুরুষতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

# নাস্তিকের যুক্তির দৌড়

শমসের আলী



ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর সময়ে একবার কুফা নগরীতে একজন বিখ্যাত নাস্তিক আসলো বিতর্ক করতে। বাদশাহ অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত ইমামকেই নিযুক্ত করলেন নাস্তিকের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার জন্য। দিনক্ষণ ঠিক হল। হাজার হাজার মানুষ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু ইমামের আসার কোন নাম নেই। সবাই মনে করলো ইমাম সাহেব হয়ত ভয়ে লুকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পরে ইমাম সাহেব এসে হাজির হলেন এবং দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন। উনি ইচ্ছা করেই দেরী করে এসেছিলেন। ইমাম সাহেব বললেন, আমার বাড়ি নদীর অপর পাড়ে, কিন্তু ঘাঁটে কোন নৌকা না থাকায় আমার আসতে দেরী হয়ে গেলো। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় দেখলাম, গাছের কাণ্ডগুলো নিজে নিজে ভেঙ্গে গেলো, অনেকগুলো কাণ্ড একসাথে জোড়া লেগে নিজে নিজেই নৌকা তৈরি হয়ে গেলো। তারপর আমি সেই নৌকায় করে নদী পার হলাম।

কথা শুনে নাস্তিক হেসে বলল, এটি অসম্ভব। এভাবে নিজে নিজে গাছ থেকে নৌকা তৈরি হওয়াকে কেউ বিশ্বাসই করবে না। এই কথা শুনেই ইমাম সাহেব বললেন, বিতর্ক শেষ। নাস্তিক বলল, বিতর্ক তো এখনও শুরুই হয়নি, শেষ হল কিভাবে। ইমাম সাহেব বললেন, একটি ছোট নৌকা যদি নিজে নিজে তৈরি হতে না পারে, তবে এই বিশাল আসমান জমিন, গাছপালা, সাগর, মহাসাগর, পশুপাখি কীভাবে একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজে নিজেই তৈরি হতে পারে? ইমাম আবু হানিফা রহ. -এর এই কয়েক মুহূর্তের কথাতেই নাস্তিকের অসাড় যুক্তি ভেঙ্গে গেলো।

আসলেই যুগে যুগে মুক্তমনা কিছু দুনিয়াতে থাকে। এইসব মুক্তমনাদের যুক্তির দৌড় এতোই নিম্নমানের যে, একজন মুসলিমের ইসলামের ব্যাসিক নলেজ থাকলে এবং একটি ভালো সীরাতের কিতাব পড়া থাকলেই এদেরকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা একজন স্কুল ছাত্রের পক্ষেও কঠিন কোন ব্যাপার নয়। এইসব মুক্তমনারা যেমন মূর্খ এদেরকে ফলো করা ছাগলগুলো আরও বড় মূর্খ! অথচ নিজেদের এরা বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।



# বস্তুনিষ্ঠরতা যেভাবে আমাদের সাথে বার বার প্রতারণা করলো!

-আবু আব্দুল্লাহ

আজ থেকে তিন/চার বছর পূর্বে যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হতো যে, এদেশে ইসলামি আন্দোলন সফল করতে হলে কী করতে হবে?

তখন চটকদার বেশ কিছু উত্তর পাওয়া যেতো-

১. একদল বলতেন, আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে হবে। সারাদেশের অর্থনীতি আমাদের কজায় এনে ফেলতে হবে! কিন্তু দেখা গেলো, যে দল অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করেছিল, সেই দলের অর্থব্যবস্থা তাদের নেতাদেরকে বাঁচাতে পারলো না। এখনো দলের কর্মীরা হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

২. আরেকদল বলতেন, মিডিয়া আমাদের দখলে আনতে হবে! কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, একসময় দেশে অনেক সরকার বিরোধী মিডিয়া ছিলো, কিন্তু দু/চারটি মিডিয়ার পরিণতি দেখে এখন সবকটি সরকারী মুখপাত্র হয়ে গেছে।

৩. আরেকদল বলতেন, আমাদেরকে ইউরোপ-আমেরিকা ও ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বাড়াতে হবে! কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মোদীকে এদের অভিনন্দন বার্তা, আমেরিকার কাছে হাত পাতা, তাদের দলের নিবন্ধন রক্ষা করতে পারলো না।

৪. আরেকদল বললেন, আমাদের জনশক্তি বাড়াতে হবে! কিন্তু দেখা গেলো, বর্তমানে প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ জনগণ সরকারের বিপক্ষে, কিন্তু তারপরও কি সরকারী সন্ত্রাস কমেছে? না, ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে!

এভাবে সময়ে সময়ে প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠরতা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েই যাচ্ছে। যদিও উপরোক্ত কিছু বিষয় ফেলে দেওয়ার মত নয়, কিন্তু কোনটাই মৌলিক সমস্যা নয়। এভাবে এক সময় হয়তো আমরা সব কিছু থেকে নিরাশ হয়ে কাতর কণ্ঠে ভারী নিঃশ্বাসে বলব, মাতা নাসরুল্লাহ! (কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য),



তখন শুনবো, আলা ইল্লা নাসরুল্লাহি কারীব (শোনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই)। এখন হয়তো অনেকেই বলবেন, সবপলিসি যদি আমাদের ধোঁকা দেয় তাহলে আমাদের কী করা উচিত? কী করলে আমরা এ লাঞ্ছনা-অপমান থেকে মুক্তি পাবো?

আমি বলবো, এর সঠিক উত্তর দিতে আমার ভয় লাগছে, যদি আপনারা আমাকে অন্য কিছু ভাবেন? তাই ভয়ে ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা হাদীস আপনারদের হাতে তুলে দিলাম, দেখুনতো উত্তর খুঁজে পান কিনা? ‘হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়বে, গাভির লেজ ধরবে, কৃষি কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে; তখন আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দিবেন, এবং সে অপমান ততক্ষণ পর্যন্ত তুলে নিবেন না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের দীনে ফিরে এসেছো’। [বায়হাকী, ইবনে আদী]

এবার আমরা হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু’র একটি কথা স্মরণ করি, যার বাস্তবতা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, এ কথার যথার্থতা ক্ষণে ক্ষণে অনুধাবন করছি। তিনি বলেন, ‘আমরা এমন জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের বিনিময়ে সম্মানিত করেছেন, যদি আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে সম্মান খুঁজি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে অপমানিত করবেন’।

এবার আপনারাই বলুন, মানবরচিত কুফরি ব্যবস্থা কোন ধরনের ইসলাম, যা আমাদেরকে সম্মানিত করবে?



## কিছু প্রশ্ন আছে যা খুব সরলভাবে মনে ঘুরপাক খায়

-আব্দুল্লাহ মাইমুন

যেমন- আজ বাংলাদেশে যে পরিমাণ দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে কি সে পরিমাণ দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো?

আজ ইসলামি দলগুলো যেভাবে সুসংহত, আজ থেকে আড়াই দশক পূর্বে ইসলামি দলগুলো কি এভাবে সুসংহত ছিলো?

আজ যেভাবে টঙ্গীর ময়দানে কয়েক লক্ষ মুসল্লির সমাগম হয়, আজ থেকে আড়াই যুগ পূর্বে কি সেখানে এভাবে সমাগম হতো?

তবুও কি এদেশে নাস্তিকদের সংখ্যা কমেছে?

পয়লা বৈশাখ ও ১৪ফেব্রুয়ারিতে ওদের অশ্লীলতা কমেছে? ভার্শিটিতে প্রকাশ্যে বস্ত্রহরণ বন্ধ হয়েছে? কন্ডম বিতরণ ও শাহবাগে অমানুষদের প্রকাশ্য রেলি বন্ধ হয়েছে? হিসেব করে দেখুন, দেখবেন কয়েকগুণ বেড়েছে।

কিন্তু, কেনো? এতো মসজিদ, এতো মাদ্রাসা, এতো ইসলামি দল, এতো মুসল্লি, এতো ইসলামি চিন্তাবিদ তারপরও??

কারণ, আমরা এদেশে ততটুকু ইসলাম পালন করছি যতটুকু ইসলাম এদেশের (জাতীয়তাবাদী + সেকুলার + গণতান্ত্রিক + সমাজতান্ত্রিক = কুফরি) সংবিধান অনুমোদন দেয়। এক কথায় বাবুরাম সাপুরে মার্কী ইসলাম। যাকে আমেরিকান ইসলাম বলা হয়।

এজন্যই মেয়েটি হিজাব ঠিক পড়ছে, কিন্তু পয়লা বৈশাখীতে যাচ্ছে। ছেলেটি মাথায় টুপি দিয়ে, থুতায় দাড়ি রেখে, গলায় তসবিহ বুলিয়ে শাহবাগে যাচ্ছে।

যতদিন পর্যন্ত এই জাহিলি ব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলে পরিপূর্ণ শরীয়াহ ব্যবস্থা কয়েম না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত এই পাপাচার রোধ করা সম্ভব নয়।

যেমনভাবে আলো আর আঁধার এক হতে পারে না, ঠান্ডা ও গরম এক হয় না। ঠিক তদ্রূপ মানবরচিত সংবিধান আর মানবশ্রুষ্ঠা আল্লাহপ্রদত্ত আইন কখনো এক হতে পারে না। যেভাবে হিন্দু ধর্মের ভেতর দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, ঠিক তদ্রূপ মানবরচিত কুফরি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আল্লাহপ্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কেননা ‘সালাফের পথেই খালাফের মুক্তি’ ইমাম মালিকের বাণী।

নতুবা এদেশে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আকাশের চাঁদ হয়ে থাকবে, যা ধরাও যাবে না, ছোঁয়াও যাবে না, শুধু কিতাবের ভেতর পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে থাকবে।

# সাইদ ইবনে আমের আল-জুমাহী রাযি. -এর জীবনের পাতা থেকে

দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয়কারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দানকারী একজন মহান সাহাবী।

এক বিশাল আনন্দ মিছিল। ছুটে চলেছে ‘তানঈম’ প্রান্তরের দিকে। এতে অংশ নিয়েছে মক্কার হাজারো কিশোর-যুবক আর পৌড়-বৃদ্ধরা। এছাড়াও ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক কিশোরী যুবতীও। তারা থেমে থেমে ‘লাত উযযার’ জয়ধ্বনি তুলছে। মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। সবার আগে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শৃঙ্খলিত এক বন্দীকে। তিনি রাসূলের প্রিয়তম সাহাবী হযরত খুবাইব রাযি। মুশরিকরা বিশ্বাস ঘাতকতা করে তাঁকে বন্দী করেছে। এখন তারা তাঁকে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে বদরে নিহত মুশরিকদের হত্যার প্রতিশোধ নিবে। প্রতিহিংসার জ্বালা প্রশমিত করবে।

সাইদ ইবনে আমের। মক্কার এক তরুণ যুবক। যৌবনের জোয়ারে টাইটসুর তার দেহ-মন। অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ের অধিকারী, দুরন্ত, দুর্বীর আর অপ্রতিরোধ্য তার গতি-প্রকৃতি। আজকের এই উল্লাস মিছিলে সেও পিছিয়ে নেই। হাজারো যুবকের ভিড়ে সেও চলছে মিছিলের সাথে সাথে। অনুসন্ধিৎসু মন তাকে একেবারে শৃঙ্খলিত বন্দীর নিকটে নিয়ে এল। সে লক্ষ্য করল খুবাইবের চেহারায় ভয়-ভীতির কোন ছাপ নেই। নির্ভীক-নিশ্চিন্ত এক সুখী মানুষ। যেন প্রশান্তির বন্যা বইছে তার হৃদয়রাজ্যে। এ দৃশ্য দেখে সাইদ ইবনে আমের খুব আশ্চর্য হল। মিছিল এসে ‘তানঈম’ প্রান্তরে থামল। সাইদ ইবনে আমেরের দৃষ্টি খুবাইবের দিকে। সে খুবাইব রাযি, এর গতি-বিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে চলছে। অসংখ্য নারী-পুরুষের মাঝ থেকে একটি দৃঢ় কণ্ঠ ভেসে আসলো। সাইদ লক্ষ্য করল কণ্ঠটি খুবাইবের। তিনি শুলের কাণ্ডে দাঁড়িয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘তোমরা ইচ্ছে করলে আমাকে দুই রাকাত নামাজের অনুমতি দিতে পার।’ তারা তাকে দুই রাকাত নামাজের অনুমতি দিল। তিনি কিবলামুখী হলেন এবং দু’রাকাত নামাজ পড়লেন। কতইনা সুন্দর ছিল সে দু’রাকাত নামাজ, কতইনা দ্বীপ্তিময় ছিল সে দু’রাকাত নামাজ।

তিনি নামাজ শেষ করলেন এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আল্লাহর কসম! তোমরা যদি এই ধারণা না করতে যে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি তাহলে আমি এর রুকু-সেজদাকে আরো লম্বা করতাম, সূরা-কেরাত আরো দীর্ঘ

পড়তাম।’ এ পর্যায়ে এসে সাইদ আরো মনোযোগসহ লক্ষ্য করল- কুরাইশরা জীবিত অবস্থায় খুবাইবের একটি একটি অঙ্গ হানী করছে আর বলছে, ‘তুমি কি পছন্দ কর যে- মুহাম্মদ তোমার স্থলে হবে আর তুমি মুক্তি পাবে?’ তার দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে চলছে আর তিনি বলছেন, ‘আল্লাহর কসম! এটা আমি কখনো পছন্দ করিনা যে তাঁর গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগবে আর আমি নিরাপদে পরিজনের নিকট ঘরে ফিরে যাব।’

হযরত খুবাইব রাযি, এর মুখে এই উত্তর শুনে মুশরিকরা কড়তালি দিতে লাগলো এবং হর্ষ ধ্বনি তুলতে লাগল। তারা একযোগে বলে উঠল- তাকে হত্যা কর! তাকে হত্যা কর!! এরপর সাইদ লক্ষ্য করল- শূলির কাণ্ডে দাঁড়ানো খুবাইবের চক্ষু আকাশের নীলিমায় আটকে গেছে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন: ‘হে আল্লাহ! আপনি এদের সংখ্যা শুনে নিন এবং এদের সকলকে হত্যা করুন। এদের কাউকে আপনি ছাড় দিবেন না। এরপর সাইদ লক্ষ্য করল, অসংখ্য অগনিত তীর-তরবারীর আঘাতে জর্জরিত ছিন্ন-ভিন্ন দেহ থেকে খুবাইবের প্রাণ-পাখিটি আকাশের নীলিমায় উড়ে গেছে।

কুরাইশরা মক্কা ফিরে গেল। খুবাইব রাযি, এর প্রাণহীন দেহটি ‘তানঈম’ প্রান্তরে পড়ে আছে। কালের আবর্তে সবাই তার কথা ভুলে গেছে। তবে তরুণ সাইদ ভুলেনি খুবাইবের কথা। ক্ষণে ক্ষণে খুবাইবের কথা তার মনে পড়ে, জাফ্রত অবস্থায় সে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে, আর ঘুমালে সে স্বপ্নে দেখে, যেন শূলির কাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে তারই সামনে খুবাইব এখনও নামাজ পড়ছেন। সাইদ এখনও যেন নিজ কানে শুনতে পাচ্ছে, খুবাইব যে বদ দোয়া কুরাইশদের জন্য করেছিলেন। এসব ভেবে ভেবে সাইদের মনে কম্পন ধরে যায়- যেন এখনই কুরাইশদের উপর বজ্র আঘাত হানবে এবং তাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিবে।

খুবাইব রাযি, সাইদকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন যা সাইদ জানত না। খুবাইব রাযি, তাকে শিখিয়ে গেলেন যে, প্রকৃত জীবন হল ঈমান এবং ঈমানের পথে আমরণ লড়াই করার। তাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, পাকা ঈমান থেকে আশ্চর্য সব বিষয়াদির প্রকাশ ঘটে। মজবুত ঈমান অসম্ভবকে সম্ভব করে ছাড়ে। খুবাইব রাযি, তাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি শিক্ষা দিয়ে গেলেন তা হল- যে ব্যক্তিকে তার সহচররা এতটা মুহাব্বত করে, তিনি অবশ্যই আসমানী সাহায্যপ্রাপ্ত ‘নবীয়ে মুরসাল’। এর অন্যথা হতে পারে না।



আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমেরের অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি কুরাইশদের একটি বড় মজলিসে দাঁড়ালেন এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে সাঈদ ইবনে আমের রাযি. মদীনায হিজরত করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতকে আকড়ে ধরলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ‘খাইবার’সহ তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিকাল করলেন, তখন তিনি তাঁর (সাঈদের) প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তিনি আবু বকর এবং ওমর রাযি. এর পক্ষে উন্মুক্ত তরবারী প্রমাণিত হলেন। তাঁর জীবন ছিল অনন্য- যেন তিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মনের সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, দেহের সব চাহিদা এবং কামনার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাযি. হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি. এর সততা এবং তাঁর তাকওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর নসীহত গ্রহণ করতেন এবং তাঁর কথা গুরুত্বসহকারে শ্রবণ করতেন।

হযরত ওমর রাযি. এর খেলাফতের সূচনাকাল। তিনি হযরত ওমরের মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন,

‘হে ওমর! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি- তুমি মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবে না। আর শুনে রেখ! তোমার কাজ যেন তোমার কথার খেলাফ না হয়। কেননা, সর্বোত্তম কথা হল তা, যা বাস্তবতার আলোয় আলোকিত।

‘হে ওমর! তুমি নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকল মুসলমানদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। তাদের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য এবং নিজ পরিবারবর্গের জন্য পছন্দ কর। আর তা-ই অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য এবং নিজ পরিবারের জন্য অপছন্দ কর। সত্য বাস্তবায়নের জীবন ‘যুদ্ধে’ কাঁপিয়ে পড়। আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করোনা।’

হযরত ওমর রাযি. বললেন, হে সাঈদ! এমনটা কে করতে পারবে?

সাঈদ বললেন, ‘তোমার মত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; তারাই এমনটা করতে পারবে আল্লাহ ও তার মাঝে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক দাঁড়াতে পারে না।’

ওমর রাযি. তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগী বানাতে চাইলেন। বললেন, ‘হে সাঈদ! আমি তোমাকে হিমসের গভর্নর নিয়োগ করছি।’ একথা শুনে সাঈদ রাযি. বললেন, ‘হে ওমর! তোমাকে আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি তুমি আমাকে ফেৎনায় ফেলনা।’ একথা শুনে ওমর রাযি. রেগে গেলেন। তিনি বললেন, ‘আশ্চর্য তোমাদের অবস্থা! তোমরা আমার কাঁধে সব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ছাড়ব না।’ ওমর রাযি. তাকে হিমসের গভর্নর বানিয়েই ছাড়লেন। গভর্নর নিয়োগের পর হযরত ওমর রাযি. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আমি কি তোমার জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা চালু করে দিব না?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘ভাতা দিয়ে আমি কী করবো, হে আমীরুল মু‘মিনীন! আমি যদি ভাতা গ্রহণ করি তাহলে তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। এরপর সাঈদ ইবনে আমের রাযি. হিমসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি. হিমস (আলেপ্পো) গমন করেছেন অল্প কয়েক দিন হয়েছে। হিমসের নির্ভরযোগ্য লোকদের একটি প্রতিনিধি দল আমীরুল মু‘মিনীনের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মদীনায আগমন করলেন। হযরত ওমর রাযি. তাদেরকে বললেন- তোমাদের সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা আমার কাছে পেশ কর- আমি তাদের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করব। তারা হযরত ওমরের কাছে একটি তালিকা পেশ করলেন- তাতে অন্যান্য নামের সাথে সাঈদ ইবনে আমের নামটি দেখে হযরত ওমর রাযি. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই সাঈদ ইবনে আমের কে? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের আমীর। ওমর রাযি. বললেন, ‘তোমাদের আমীরও কি গরীব?’ তারা বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! মাঝে মাঝেই লাগাতার কয়েকদিন এমনও অতিবাহিত হয় যে তাঁর চুলায় আগুনও জ্বলে না। এ কথা শুনে হযরত ওমর রাযি. কাঁদতে লাগলেন। চোখের অশ্রুতে তাঁর দাড়ি মোবারকও সিক্ত হল। অতঃপর হযরত ওমর রাযি. এক হাজার দিনার একটি থলের মধ্যে পুরে তাদের হাতে দিয়ে বললেন, ‘আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছাবে এবং বলবে- আমীরুল মু‘মিনীন আপনার জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন যেন এগুলো দিয়ে আপনি নিজ প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

প্রতিনিধি দলটি হিমসে পৌঁছল। তারা থলেটি হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি. এর নিকট পেশ করল। তিনি এতে দিনার দেখতে পেয়ে এগুলো থেকে দূরে সরতে লাগলেন এবং

بَلَّغْتُهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলতে লাগলেন- যেন বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে বিচলিত কণ্ঠে তাঁর স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘আপনার কী হয়েছে? আমীরুল মু‘মিনীন কি ইস্তিকাল করেছেন?’

তিনি বললেন: না, বরং ঘটনাটি এর চেয়েও কঠিন।

স্ত্রী বললেন: মুসলমানরা কি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন?

তিনি বললেন: ঘটনাটি আরো ভয়াবহ।

তার স্ত্রী বললেন: এর চেয়ে ভয়াবহ ঘটনা আর কী হতে পারে?

তিনি বললেন: আমার আখেরাতকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করেছে আর ফিৎনা আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

তাঁর স্ত্রী বললেন: আপনি নবাগত এই ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকুন। (দিনারের বিষয়টি তার স্ত্রী মোটেও জানতেন না) তিনি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন: এ ব্যাপারে তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করতে পারবে?

স্ত্রী বললেন: হ্যাঁ, আমি অবশ্যই পারব।

এরপর তিনি এগুলোকে কয়েকটি থলের মধ্যে পুরে দরিদ্র মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। এর কিছুদিন পরই সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর রাযি. সিরিয়া গমন করলেন। তিনি যখন হিমসে অবতরণ করলেন তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানাল। হযরত ওমর রাযি. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা তোমাদের আমীরকে কেমন পেয়েছ?’ উত্তরে তারা তাদের আমীরের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ করল। একটি অভিযোগ অন্যটির চেয়ে মারাত্মক ছিল।

হযরত ওমর রাযি. বলেন, আমি তাদের সকলের মাঝে উপস্থিত হলাম আর মনে মনে দোয়া করলাম আল্লাহ তাআলা যেন তার ব্যাপারে আমার সুধার্নাকে ভুল প্রমানিত না করেন। আমি ছিলাম তাঁর ব্যাপারে বড়ই আস্থাশীল। যখন তারা এবং তাদের আমীর আমার মজলিসে একত্রিত হল তখন আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম- তোমাদের আমীরের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিযোগ বল।

তারা বললো- অনেক বেলা করে তিনি আমাদের নিকট গমন করেন।

হযরত ওমর রাযি. বলেন, আমি তখন বললাম, ‘হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?’

ক্ষণিক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, এ ব্যাপারটি কারো নিকট প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার ছিলনা। কিন্তু এখন না বলে পারছি না। আসল কথা হল- আমার পরিবারে কোন খাদেম নেই তাই প্রতিদিন সকালে উঠে আমি গম পেষণ করে আটা তৈরী করি। আটাগুলো কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে খামীরা তৈরী করি। এরপর রুটি বানিয়ে উয়ু করে লোকদের নিকট গমন করি।

এ কথা শুনার পর হযরত ওমর রাযি. বললেন, ‘তার ব্যাপারে তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কী?’

উত্তরে লোকেরা বলল, ‘রাতে তিনি কারো ডাকে সাড়া দেন না।’

ওমর রাযি. বললেন, ‘হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী? বল-’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘এ ব্যাপারটিও আমি কারো নিকট প্রকাশ করতে চাইনি। ‘আমি দিনকে তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখলেও রাতকে খালি রেখেছি আল্লাহর জন্য।’

ওমর রাযি. লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার ব্যাপারে তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, তিনি মাসে একদিন সাধারণ এজলাস বন্ধ রাখেন।

হে সাঈদ ! এমনটা তুমি কেন কর?

সাঈদ ইবনে আমের রাযি. বললেন, ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আপনি তো জানেন আমার কোন খাদেম নাই। আর কাপড় বলতে আমার গায়ের এ জামাটিই, এছাড়া আমার আর কোন জামা নেই। এটিকে আমি মাসে একবার ধৌত করি এবং শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। শুকিয়ে গেলে দিনের শেষ বেলা আমি লোকদের নিকট বের হই।’

ওমর রাযি. বললেন, ‘তার ব্যাপারে তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে?’

লোকেরা বলল, মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন- ফলে ঐ দিন তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হতে পারেন না।

ওমর রাযি. বললেন, হে সাঈদ! এমনটা কেন হয়?

উত্তরে তিনি বললেন, ‘জাহেলী যুগে খুবাইব ইবনে আদী রাযি. কে যখন গুলে চড়ানো হয় তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন দেখে ছিলাম কুরাইশরা কীভাবে তাঁর একেকটি অঙ্গকে হানী করছে আর বলছে- তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, মুহাম্মাদ তোমার স্থানে হবে আর তুমি বেঁচে যাবে? তখন তিনি বলছিলেন, আমি এটাও পছন্দ করিনা যে আমি নিরাপদে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব আর মুহাম্মাদ সা. এর গায়ে একটি কাঁটার আঁচর লাগবে। সেদিনের কথা স্মরণ হলে তখন আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। কেননা, সেদিন আমি তার কোন সাহায্য করিনি। আমার মনে হয় আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করবেন না। এসব কিছু শোনার পর হযরত ওমর রাযি. বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর ব্যাপারে আমার সুধার্নাকে সঠিক প্রমাণিত করেছেন।

এরপর হযরত ওমর রাযি. তাঁর জন্য এক হাজার দিনার পাঠালেন যেন এর দ্বারা তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। দিনারগুলো দেখে হযরত সাঈদের স্ত্রী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! ভালোই হল এখন আপনি আপনার কাজের জন্য অবসর হতে পারবেন। বাজার সওদা করে নিয়ে আসুন আর আমাদের জন্য একজন খাদেম নিয়োগ করুন।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘তোমার জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু ব্যবস্থা করে দিব কি?’

তার স্ত্রী বললেন, সেটা কী?

তিনি বললেন, এগুলো আমরা এমন কারো নিকট আমানত রাখবো যিনি অতি প্রয়োজনের সময় আমাদেরকে তা ফিরিয়ে দিবেন।

তার স্ত্রী বললেন, ‘এর সূরত কেমন হবে?’

তিনি বললেন, ‘এগুলো আমরা আল্লাহ তাআলাকে করজ দিব।’

তার স্ত্রী বললেন, ‘আচ্ছা তাই করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।’

ব্যাস, সেই মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই তিনি দীনারগুলোকে কয়েকটি থলের মধ্যে পুরলেন। এরপর তাঁর পরিবারের একজন কে বললেন, এগুলো অমুকের বিধবা স্ত্রীকে দিয়ে আসবে, এগুলো দিয়ে আসবে অমুকের ইয়াতীম সন্তানদেরকে। আর এগুলো ঐ বাড়ীর মিসকিনদেরকে দিয়ে আসবে।

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী রাযি. এর উপর রহম করুন। তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দিতেন।

হে আল্লাহ ! আমাদেরকে তাঁর মত জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।



শৈরাচার অতি দ্রুত একজন শাসককে জালেমে পরিণত করে। শাসকের মর্জির বিরুদ্ধে যে কোনো কাজই দণ্ডনীয় অপরাধ। এমনকি তার সামান্য নারাজি প্রাণদণ্ডের কারণ।

মুসলমানদের মধ্যে যখনই রাজতন্ত্রের প্রচলন হয়েছে তখন থেকে জুলুমতন্ত্রও সমানতালে এগিয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম এমন একটা নেজামের প্রচলন করেছে যার মূল কথাই হল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং কেয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ফলে শাসকের নিজের এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি থাক বা না থাক, শাসিতদের মধ্য থেকে সব সময় একদল লোক এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এসেছে। মুসলমানদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এ ধরনের লোকের অভাব হয়নি, ততদিন পর্যন্ত জালেম শাসক তার জুলুমের পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম দিতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামী বিশ্বে রাজতান্ত্রিক শাসনের গোড়ার দিকে জুলুমতন্ত্র যেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো, তেমনি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মর্দে মুজাহিদের সংখ্যাও কম ছিলো না।

আব্বাসী শাসনের গোড়ার দিকে জালেম শাহীর বিরুদ্ধে এমনি একজন নির্ভীক প্রতিবাদকারী ছিলেন সুফিয়ান সাওরী রহ. ৯৬ হিজরীতে তার জন্ম এবং মৃত্যু ১৬১ হিজরীতে। তিনি ছিলেন একজন তাবেতাবেরী এবং তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুজতাহিদ। তার সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ. বলেন, ‘ইতিপূর্বে ইরাকে ধন-সম্পদ ও পোষাকের প্রাচুর্য ছিলো কিন্তু; সুফিয়ান সাওরী যখন সেখানে গিয়েছেন তখন থেকে সেখানে এলেম ও জ্ঞান চর্চার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছেন। তাঁর ইলমিয়াত এতো উচ্চ পর্যায়ে ছিলো যে সমকালীন সকল আলেম ছিলেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

উমাইয়া রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবু জাফর মনসুর তখন বাগদাদের সিংহাসনে আসীন। এ সময়কার ঘটনা। অন্য দিনের মত সেদিনও ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. এর দরস চলছিল। তার পাশে জড়ো হয়ে বসে আছে এলেম পিপাসু ছাত্রসহ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ। এমন সময় সেখানে হাজির হলো বাদশাহ মনসুরের বার্তাবাহক। সালাম ও হালপুরসির পর সে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে নিজের আস্তিনের ভাঁজ থেকে সীলমোহর যুক্ত একটি পত্র ইমামের সামনে পেশ করলো। অতঃপর বলল ‘এটা আমীরুল মুমিনীনের পত্র’। সুফিয়ান সাওরী রহ. পত্র হাতে নিয়েছিলেন কিন্তু; আমীরুল মুমিনীনের নাম শুনতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এমন জিনিসে আমি হাত লাগাবো না যাকে জালেমের হাত স্পর্শ করেছে। তারপর নিজের এক শাগরিদকে চিঠিটি পড়ার হুকুম দিলেন। শাগরিদ চিঠিটি খুলে পড়তে লাগলো- ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুরের পক্ষ থেকে দীনী ভাই সুফিয়ান সা’দ আস সাওরীকে।

‘আমার ভাই! আপনি জানেন, আল্লাহ মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এই ভ্রাতৃত্বের পথ ধরেই আপনাকে আমি ভালোবাসি। খিলাফতের জিজিরে আটকা না থাকলে আমি নিজেই আপনার খিদমতে হাজির হয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে সুমহান মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। এমন কেউ নেই যে আমাকে এ জন্য মুবারকবাদ দেয়নি। আমার অর্থ ভাণ্ডারের মুখ খুলে দিয়ে বসে আছি। যে আসছে এখান থেকে নিয়ে খুশী হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই দান, বখশিস, বদান্যতা ও মহানুভবতা আমার চোখের জ্যোতি ও হৃদয়ে অনাবিল শান্তির পসরা বয়ে আনছে কিন্তু; আপনি এখনো কষ্ট করে একবার আসলেন না। এই পত্রখানি আপনার বহু আকাঙ্ক্ষিত আগমনের আর্জি হিসেবে পেশ করলাম। হে আবু ওবাইদ! আপনি জানেন মুমিনের যিয়ারত এবং তার সাথে মোলাকাতের ফজিলত। কাজেই পত্র পেয়েই তাশরীফ আনার চেষ্টা করবেন।’

সুফিয়ান সাওরী রহ. পত্রপাঠ শুনছিলেন এবং তাঁর চেহারা বিরক্তি ও ক্রোধের ছটা প্রকাশ পাচ্ছিল। পত্র পাঠ শেষ হলে ইমাম বললেন, এই পত্রের অপর পিঠেই জালেমের জবাব লিখে দাও। উপস্থিত শুভাকাজীরা বললেন, হে আবু ওবাইদ! আমীরুল মুমিনীনের ব্যাপার। জাবাব আলাদা কাগজে লিখে দিলে ভালো হয়। বললেন, এই পত্রের পিঠেই লিখো। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে যদি এই পত্রের কাগজ সংগৃহীত না হয়ে থাকে তাহলে মনসুরকে এর সাথেই জাহান্নামের আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হবে। আমার এখানে আমি এমন কোন জিনিস রাখা পছন্দ করবো না যাকে জালেমের হাত স্পর্শ করেছে। এমন জিনিস আমার দীনও বরবাদ করে দিতে পারে।

বাদশাহর পত্রের জবাবে লেখা হলো- ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আবু জাফর মনসুরকে, যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতারণার জালে আবদ্ধ, ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ যার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং যে কুরআন তেলাওয়াতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেখো, আমি তোমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, আমার ও তোমার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা খতম হয়ে গেছে। তুমি তোমার পত্রে নিজেই স্বীকার করেছো যে, তুমি মুসলমানদের বাইতুলমাল অথথা তসরুফ করছো। তোমার পত্র যাদের সামনে পঠিত হয়েছে তাদের সবাইকে তোমার অপরাধের সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো এবং কাল যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, তখন আমরা সবাই এর সাক্ষ্য দেবো।’

‘হে মনসুর! তুমি মুসলমানদের সম্পদ বরবাদ করছো। আল্লাহর পথের মুজাহিদরা, গরীব, দরিদ্র, এতিম, শিশু ও বিধবা নারীরা এবং তোমার বাকি প্রজাকুল কি তোমার এ কার্যকলাপ সমর্থন করে?



‘হে মনসুর! তুমি রাজ সিংহাসনে বসে আছো। রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করছো। তোমার দরজায় পর্দা লটকে রেখেছো। জালেম সিপাহীরা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন চালায়, কিন্তু সেই মজলুমদের ফরিয়াদ শোনার জন্য কেউ আসে না। তোমার লোকেরা অন্যকে শরাব পানের জন্য দণ্ড দেয় অথচ নিজেরা শরাব পান করে। ব্যভিচারীকে শাস্তি দেয় কিন্তু নিজেরা ব্যভিচার করে। চোরদের হাত কাটে, আর নিজেরা চুরি করে। হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দেয় অথচ নিজেরা হত্যা ও খুন-খারাবির ব্যাপারে খুনির চেয়েও নির্ভীক ও বেপরোয়া। আল্লাহর মাখলুক তাদের জুলুমে অতিষ্ঠ কিন্তু তার কোন চিন্তাই তোমাদের নেই। বরং যারা নিজেদেরকে এসব অন্যায্য থেকে সরিয়ে রেখেছে তাদেরকেও তুমি এই পাপে জড়িয়ে ফেলতে চাও। তোমার দান ও বদান্যতার কোন প্রয়োজন আমার নেই এবং তোমার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতেও আমি চাই না।’

সুফিয়ান সাওরীর রহ. -এর জবাব মনসুরকে ক্রুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার হাত-পা ছিলো বাঁধা। বনি উমাইয়াকে হটিয়ে বনী আব্বাস সবেমাত্র ক্ষমতার আসনে বসেছিল। এখনো আসন পাকাপোক্ত হয়নি। সাধারণ মুসলমানদের পুরোপুরি সমর্থন এখনো তারা লাভ করতে পারেনি। ওলামা, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও সমাজে পরিচিত সং ব্যক্তিদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের এখনো তাদের অনেক প্রয়োজন ছিল। সাধারণ মুসলমানদের ওপর এদেরই প্রভাব বেশি। এদের সমর্থন লাভ করার পরই তারা নিজেদের সমস্ত কাজের বৈধতার ছাড়পত্র লাভ করতে পারবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সুফিয়ানকে এ পত্র লেখা হয়েছিল কিন্তু; সুফিয়ান সাওরী তাদের হাতে ধরা দেননি। তাদের জুলুমকে বৈধতা দান করার জন্য তার সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্কে ব্যবহার করা যেতে পারে এই আশংকায় তিনি তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে চাননি।

একবার হজ্জের মওসুমে মসজিদে হারামে সুফিয়ান সাওরী রহ. এর সাথে মনসুরের দেখা হয়ে গেল। মনসুর তার কাঁধে হাত রেখে কাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, এই গৃহের রবের কসম! আমাকে আপনি কেমন মানুষ পেয়েছেন? সুফিয়ান নির্দিষ্টভাবে জবাব দিলেন- এই গৃহের রবের কসম! ‘আমি তোমাকে নিকৃষ্টতম মানুষ হিসেবে পেয়েছি।’

একবার মনসুর তাকে হত্যা করার সংকল্প করলেন। হজ্জে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হুকুম দিলেন, হারাম শরীফের বাইরে শূলদণ্ড প্রস্তুত করো। তিনি জানতে পারলেন, সুফিয়ান সাওরী মসজিদে হারামে আছেন। ফুয়াইল ইবনে ইয়াযের কোলে মাথা এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কোলে দুই পা রেখে তিনি শায়িত ছিলেন। মনসুরের হুকুম এবং তার আসার খবর শুনে ফুয়াইল ও ইবনে উয়াইনা ভয় পেয়ে গেলেন কিন্তু; সুফিয়ান সাওরী রহ. বললেন, কাবার রবের কসম! এ গৃহে প্রবেশ করার সৌভাগ্য মনসুরের নেই। তারপর উঠে বসলেন এবং কাবার গিলাফ ধরে দোআ করলেন- হে আল্লাহ! আমাকে মনসুরের হাত থেকে নাজাত দাও। নিজের রবের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি একান্ত নির্ভরতায় পরিপূর্ণ এ দোআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলো। মনসুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তার লাশ মক্কায় পৌঁছলো।



## ভারতের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার স্বার্থে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া ও আমার উপলব্ধি

-আব্দুল্লাহ মাইমুন

শুধুমাত্র খেলার জন্যে একটি আলিয়া মাদ্রাসা বন্ধ করে দিলো। ‘যেদিন ‘কওমী’ মাদ্রাসাকে আবুল মাল ভয়ঙ্কর বলেছিলো সেদিন আলিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলো যে, এরমধ্যে আর স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ধর্মীয় কয়েকটি সাবজেক্ট ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান’। এরপরও কেনো এই নিরাপদ সরকার নিয়ন্ত্রিত জঙ্গিবাদ মুক্ত প্রতিষ্ঠান দাদাবাবুদের নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হলো? এজন্যে যে, এর নাম মাদ্রাসা, এরমধ্যে নামমাত্র হলেও ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যেখানেই ইসলাম সেখানেই জঙ্গিবাদ, শামীম আফাজলের ভাষ্যমতে ‘সব মুসলমান জঙ্গি না হলেও সব জঙ্গি মুসলমান’! তো এর দ্বারা কী বোঝা গেলো? যে, আমরা জালিম সরকার বা তাগুতের সাথে যতই আপোষ করি না কেন, ওরা কিন্তু আমাদের প্রতি মোটেও নমনীয় হবে না, আমাদেরকে মোটেও নিরাপদ ভাববে না।

আজ যারা কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গিবাদের আস্তানা বলছে, (আল্লাহ না করুন) যদি কওমী মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এরা পরদিন থেকে আলিয়া মাদ্রাসাকে জঙ্গিবাদের আস্তানা বলবে, যদি আলিয়া মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা জাতীয় সিলেবাসে ইসলামশিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করবে। এভাবে একের পর একে ছুতোয় ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে। মোটকথা এদেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করার আগ পর্যন্ত এরা থামবে না। তাই এদের ভয়ে আমরা পরিবর্তিত হয়ে যতই মডারেট-সংস্কারবাদী-শান্তিবাদী(!) ইত্যাদি হই না কেনো? ওরা কিন্তু আমাদের পিছু ছাড়বে না।

সুতরাং আদর্শচ্যুত লাঞ্চিত হয়ে মরার চেয়ে অটল অবিচল অবস্থায় সম্মানের সাথে মরা ভালো।



## গুয়ানতানামো বন্দীশালার কারারক্ষী টেরি হোল্ডব্রকের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী - তানভীর

২০০৩ সালের কথা। ১৯ বছরের উশুজ্বল এক চনমনে যুবক। মদ, যৌনতা আর রক-এন্ড-রোল মিউজিকে ডুবে থাকা অন্ধকার জীবন। হাতে ট্যাটু আঁকা, ‘উন্নাও হয়ে যাও’, ‘ঈশ্বর বলে কিছু নেই, দুনিয়ার জীবনই সব’-ভাবতেন টেরি হোল্ডব্রক।

এমন গা-ভাসানো আর ভোগে-মত্ত জীবনে ডুবে থাকা টেরির মত তরুণেরা পশ্চিমা সমাজে মোটেও দুঃস্থাপ্য নয়। পারিবারিক বাঁধা-বন্ধনহীন, বন্ধু-আড্ডা-গানে বঁদে থাকা বস্ত্রবাদী সমাজে এমন যুবক রাস্তার অলিতে গলিতে মেলে। বন্ধু-আড্ডা-গানে হারিয়ে যাওয়া মানুষের দায়িত্বশীল হতে শেখে না। টেরির বয়স যখন সাত, টেরির বাবা-মা তাকে ছুঁড়ে ফেলে যে যার মত পথ বেছে নিয়েছিল। টেরি বড় হলেন দাদার কাছে। দাদাও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করতেন না, শেষকালে অবশ্য বদলে গিয়েছিলেন।

টেরি পরিণত বয়সে পৌঁছলেন। ভাবলেন কিছু তো একটা করা দরকার। ৯/১১ এর কিছু পরের ঘটনা, ফ্ল্যাপাটে টেরি মিলিটারিতে গিয়ে বললেন, বেতন দিলেই তিনি মানুষ হত্যা করতে রাজি আছেন। আমেরিকায় তখন নতুন রিক্রুট করা হয়েছে অনেক সৈন্যকে। টেরি চাকরি পেলেন। বিশেষ বোনাস সুবিধা দেখে ‘মিলিটারি পুলিশ’ এর চাকরিটি গ্রহণ করলেন।

ইসলাম নিয়ে তখন টেরির কোন ধারণাই ছিল না। ইসলাম সম্পর্কে তার সকল জ্ঞান ৯/১১ এ সীমাবদ্ধ। তাকে বারবার ৯/১১ এর ভিডিও দেখানো হত, বলা হত, ‘গুয়ানতানামো বে’তে যারা আছে, তারা এসব করেছে; তারা মানুষ নয়। তারা সামনে পেলেই তোমাকে খেয়ে ফেলবে। এদের সাথে কথা বলবে না, মেলামেশা করবে না’। টেরির দায়িত্ব পড়ল গুয়ানতানামোর কারারক্ষী হিসেবে। কারাগারে গার্ড দিতে গিয়ে এক ‘জঙ্গি’কে আবিষ্কার করলেন, তার বয়স ১২! টেরি বুঝে উঠতে পারলেন, যে ছেলে এখনো সাগর দেখে নি, যে ছেলে এখন দুনিয়া কীভাবে চলে তা জানে না, সে ‘ওয়ার অন টেরর’ এর কী বুঝে?

১২ বছর বয়সের ‘হাই সিকিউরিটি থ্রেট’ জঙ্গি ছাড়া টেরি আরো দেখলেন, কিছু সাধারণ মুসলিমদের, যাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা হয়েছে। তাদের কেউ ট্যাক্সি ড্রাইভার, ডাক্তার, প্রফেসর, সত্তরোর্থ বৃদ্ধ। টেরির দায়িত্ব ছিল

কারাবন্দীদেরকে ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে নিয়ে আসা। গুয়ানতানামো বে’র কারাগারে নিষ্ঠুর আর অমানুষিক নির্যাতনের সাক্ষী তিনি। তিনি বলেন, ‘বন্দীকে শিকলে বেঁধে তাদের উপর হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত, কুকুরগুলো তাদের মুখের ঠিক সামনে ঘেউ ঘেউ করত এবং কখনো কামড়ে দিত’। তিনি সেখানকার অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ দেন, ‘প্রচণ্ড চাপের মুখে রাখা হত কারাবন্দীদের, তাদের লোহার খাঁচায়, প্রচণ্ড ঠান্ডার মাঝে ফেলে রাখা হত দিনের পর দিন’। এমন কারাবন্দীও আছে গুয়ানতানামো বে’তে, যাদের রুমের লাইট গত ৬/৭ বছর ধরে বন্ধ করা হয়নি। ক্ষণিকের জন্য তারা অন্ধকারে শান্তিতে ঘুমুতে পারেননি। উপরন্তু, টর্চারের সময় তাদের মুখের সামনে ৪০ ডিগ্রী তাপমাত্রার আলো জ্বালিয়ে রাখা হত। কানের কাছে গান বাজানো হত ঘন্টার পর ঘন্টা। অথচ তাদের কারোরই অপরাধ প্রমাণিত নয়, কেবল মুসলিম বলে সন্দেহভাজন হিসেবে ধরে আনা হয়েছে।

বন্দীদেরকে যৌন নির্যাতন করা হত মহিলা সৈন্যদের দ্বারা নিকৃষ্টতম উপায়ে। তারা জানতো, মুসলিমরা নামাজের আগে পাক-পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করে। টেরি আব্দুল হাদী নামের সিরিয়ার এক কমবয়সী ছেলের কথা বলেন- জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনের পর এক মহিলা সৈন্যকে দিয়ে তাকে sexually harras করে এবং তার মুখে ঋতুকালীন নাপাক রক্ত মাখিয়ে তাকে সেলে পাঠিয়ে দেয়। চারদিন তাকে গোসলের জন্য পানি দেওয়া হয় নি, যেন সে নামায আদায় করতে না পারে।

টেরি বলেন, গুয়ানতানামো বে’তে বন্দীদের নির্যাতন করা হত কোন কারণ ছাড়াই। কথা নেই, বার্তা নেই, চার-পাঁচ জন এসে কোন বন্দীকে ধরে বেধড়ক পেটাতে শুরু করত। কখনও দরজার মধ্যে হাত-পা চাপা দিত। তারা বন্দীদের মাথা ধরে ক্রমোড়ে চুবিয়ে দিয়ে ফ্লাশ করে দিত। কখনও মরিচের গুঁড়া স্প্রে করে দিত বন্দীদের মুখে। গুয়ানতানামোর কীটপতঙ্গ এবং ঝেঁড়ে ইঁদুরগুলো বেশি অধিকার আর নিরাপত্তা ভোগ করত মুসলিম বন্দীদের থেকে। এসব প্রাণীকে ছুঁলে বা ক্ষতি করলে ছিল হাজার ডলার জরিমানা, অথচ মুসলিম বন্দীদের যা খুশি করা যেত। মুসলমান বলে কথা! তাদের পশু অধিকারও থাকতে নেই!



কাফের হলেও নীতিহীন ছিলেন না টেরি। তিনি কারাবন্দীদের সাথে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলতে চেষ্টা করলেন। তার সহকর্মীরা বিষয়টি পছন্দ করত না। তারা তাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলত, ‘আমরা আজকেই তোমার মাথা থেকে তালিবানদের ভূত তাড়াবো’। তবু টেরি হাল ছাড়লেন না। অবাক হয়ে দেখলেন এই মুসলিমদের উপর শত অত্যাচার আর নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের মাঝে কি যেন একটা প্রশান্তি আর সমৃদ্ধি আছে। বন্দী হয়েও তারা যেন মুক্ত, আর কারারক্ষী হয়েও টেরি যেন বন্দী। সবসময় বস এর অর্ডার মানতে গিয়ে তার নিজেকে মনে হত দাস। তার যেন থেকেও নেই, আর বন্দীদের কিছু নেই তবু তাদের মুখে হাসি। নাইট শিফটের সময়ে তিনি বন্দীদের সাথে খোলাখুলিভাবে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন- ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, কালচার, নৈতিকতা সবকিছু। কারাবন্দীদের ইসলাম চর্চায় তিনি মুগ্ধ হলেন।

ইসলামের মধ্যে তিনি তা আবিষ্কার করলেন যার সন্ধান এতদিন তিনি করে আসছিলেন, শৃঙ্খলা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা, যা একজন মানুষের হৃদয়কে তুষ্ট করতে পারে। অবাধ স্বাধীনতা কেবল মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে, কখনই তা হৃদয়কে শান্ত করতে পারে না। তিনি আল্লাহর দাসত্বের মাঝে শান্তি পেতে শুরু করলেন।

আহমেদ এরাচিদি নামের এক মরোক্কানের সাথে টেরির পরিচয় হল কারাগারে। আহমেদ প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর গুয়ানাতানামোয় বন্দী ছিলেন। আল-ক্বায়েদার ট্রেনিংক্যাম্পে যোগ দেওয়ার অভিযোগে তাকে আটকে রাখা হয়। আহমেদ তার কুরআনের কপিটি টেরিকে পড়তে দিলেন। টেরি কুরআন পড়তে শুরু করলেন এবং এর মাঝে তিনি যুক্তিবোধের ছোঁয়া পেতে থাকলেন। খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি; কিন্তু তিনি ইসলামের প্রেমে পড়ে গেলেন। তার ভাষায়, ‘আমি যতই ইসলামকে জানতে লাগলাম, ইসলাম যেন ততই আমার কাছে আসতে লাগল’।

টেরির অন্য সহকর্মীরা যেখানে পর্নোগ্রাফি, নেশা আর খেলাধুলায় মত্ত, টেরি তখন ইসলাম নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত। আজকের গতানুগতিক মুসলিমদের যেখানে বছরে এক ঘন্টাও ইসলাম নিয়ে পড়াশোনার সময় হয় না, সেখানে টেরি প্রতিদিন ইসলামকে জানতে ও বুঝতে সময় ব্যয় করতে থাকেন। একটা সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, হ্যাঁ, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন।

এক কারাবন্দীর কাছে গিয়ে জানালেন এ কথা। সে বলল, ‘তুমি ভালো করে ভেবে দেখেছ তো? ইসলাম কোন হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়, এটা সিরিয়াস ব্যাপার, এটা তোমার জীবনকে আমূল বদলে দিবে। তোমাকে মদ খাওয়া ছাড়তে হবে, শরীরে ট্যাটুবাঁজি বন্ধ করতে হবে, নোংরা কাজকর্ম ছেড়ে দিতে হবে। তোমার চাকরিহারা হবার সম্ভাবনা আছে। নিজ পরিবার তোমাকে ত্যাগ করতে হতে পারে, পারবে?’

টেরি ভেবে দেখলেন, হ্যাঁ তিনি পারবেন; ইসলামের আলো যার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে কেনই বা পারবে না দুনিয়ার চাকচিক্য ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফিরতে? অবশেষে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে টেরি কারাবন্দীদের মাঝে আরবীতে ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ

হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! ইসলাম কত আশ্চর্যজনকভাবে মানুষকে বদলে দিতে পারে! আল্লাহ কুরআনে বলেন,

﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

‘পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সহজ-সঠিক পথে পরিচালিত করেন’। -সূরা বাক্বার:১৪২

টেরি মদপান ছেড়ে দিলেন, গান-বাজনাও ছেড়ে দিলেন। ভেবে দেখুন, অমুসলিম হয়ে জন্ম নেওয়া এক যুবক কত সহজেই আল্লাহর জন্য প্রিয় কিছু ছাড়তে পারছেন। অথচ মুসলিম হয়ে জন্ম নিয়ে আমরা আজকে আল্লাহর দীনের খোড়াই কেয়ার করছি। টেরির ইসলাম গ্রহণের কথা তার সহকর্মীরা জানলে সমস্যা হতে পারে বিধায় তাকে লুকিয়ে নামাজ পড়তে হত, ঘনঘন তাকে বাথরুমে যেতে হত। অথচ আমাদের নামকা ওয়াস্তে মুসলিমদের জুম্মার নামাজ পড়তেই কত না আলসেমি; কোন ভয় নেই, ঝুঁকি নেই, তবুও!

২০০৪ সালে টেরিকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ‘general personality disorder’ এর অজুহাতে। গুয়ানাতানামো বে’তে যতদিন ছিলেন, তার ইসলাম চর্চা ভালোই চলছিল; কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার পর আবার এলোমেলো হয়ে গেল। কিছুকালের জন্য তিনি জাহেলিয়াতের মাঝে সুখ খোঁজার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। আবার ইসলামে ফিরে আসলেন টেরি। টেরি পেছনে ফিরে দেখেন, কেবল ইসলামের মাঝেই তিনি স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন, অন্য কিছুই তাকে খুশি করতে পারেনি।

টেরি হোলব্রুক গুয়ানাতানামোর সেই অল্প কিছু কারারক্ষীদের একজন যারা কিনা আমেরিকার শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মিথ্যা আশ্বাসকে তুলে ধরছেন সবার সামনে। তিনি বলেছেন, আমেরিকানদের লজ্জা পাওয়া উচিত এই জঘন্য কারাগারের মালিক হওয়ার জন্য। তিনি বর্তমানে তাই কাজ করে যাচ্ছেন ‘মুসলিম লিগ্যাল ফান্ড অফ আমেরিকা’র সাথে। যেসকল আমেরিকান নাগরিক অন্যায়ভাবে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে বন্দী হয়ে আছেন তাগুতের কারাগারে, তাদের মুক্তির জন্য তারা ফান্ড তুলছেন এবং আইনগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

টেরি হোলব্রুক এখন আর টেরি হোলব্রুক নন, তিনি এখন মুস্তফা আব্দুল্লাহ। মুস্তফা আব্দুল্লাহ হয়ে থাকুক জাহেল মুসলিমদের জন্য একজন চোখে-আঙ্গুল-দেখানো উদাহরণ। আল্লাহ তাকে কবুল করে নিন। আমীন।





# বন্ধু!

## কেমন যেন হয়ে গেছি...

-নাজমুস সাকিব

বন্ধু!

আমি জানি আমাকে নিয়ে তুমি খুব হতাশ। খুব বিরক্ত। কেমন জানি হয়ে গেছি আমি। কেমন যেন। অস্বাভাবিক। আমি জানি তুমি আমাকে দেখলে, আমার কথা শুনলে, আমার কথা মনে পড়লেই ফিরে যাস পেছনের দিনগুলিতে। যখন আমরা একসাথে গান শুনতাম। একসাথে মুভি দেখতাম। দল বেঁধে সব এখানে ওখানে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতাম। কী ছিলনা সেই আড্ডায়? নাটক, সিনেমা, খেলা, তারকা; পরস্পরকে পচানো, গালাগালি, গান, মিউজিক, গার্ল ফ্রেন্ড, মেয়ে... কী ছিলনা? কত মজাই না করেছি।

আমি জানি তুমি এখনো ভাবনায় ডুবে যাস সেইসব দিনের কথা মনে করে, যখন আমরা একসাথে গলা মিলিয়ে বলতাম, ‘কি আছে জীবনে? একটাই তো জীবন!’ তখন জীবন মানেই ছিল সিজিপিএ নিয়ে হা-হতাশ আর বিনোদনের সাগরে সাঁতরে বেড়ানো।

আমি জানি তুমি এখনো ভেবে পাসনা কী হতে কী হয়ে গেলো। তোর পাগলা বন্ধুটা কেন এমন হয়ে গেল। রসকষহীন। মলিন। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট।

বন্ধু! তোকে অনেক কিছু শেয়ার করেছি জীবনে। কিন্তু একটা জিনিস শেয়ার করা হয়নি। তোর সেই বন্ধুটির আরেকটি পরিচয় ছিল। সে ছিল ভীতু। সে মৃত্যুকে ভয় করতো। খুব। তোকে কখনো বলা হয়নি বন্ধু। এত আনন্দ, এত ফান, এত বিনোদন, এত চাকচিক্যের মাঝেও যখন আমি একা হয়ে পড়তাম, মৃত্যুভয় আমাকে গ্রাস করতো। যখনই শুনতাম কেউ মারা গেছে, বা কারো লাশ দেখতাম, জানাজায় যেতাম; কবরে শায়িত করার দৃশ্য দেখতাম। তখন প্রচণ্ড ভয় পেতাম। সত্যি বন্ধু। আমি মন থেকে চাইতাম যাতে আমার মৃত্যু না হয়। একদম মন থেকে। আমি মরতে চাইতাম না। মৃত্যুর কাছ থেকে আমি পালাতে চাইতাম। পরিচিত কেউ মারা গেলে আমি সপ্তাখানেক শান্তিতে ঘুমুতে পারতাম না। আমি চোখের সামনে কবরের অন্ধকার ঘরটা দেখতাম। দেখতাম আমি কাফনে মোড়ানো। আমি একা। একদম একা। ঘুটঘুটে অন্ধকার মাটির ঘরে। আপাত দৃষ্টিতে বেশ সাহসী দেখতে এই আমি ছিলাম এমন মৃত্যুভয়ে কাতর।

বন্ধু! এই মৃত্যুভয় আমাকে কেমন করে জানি বদলে দিতে লাগলো। একদম ধীরে ধীরে। আমি ভাবতে লাগলাম এমন একটা দিনের কথা, যেদিন আমি সত্যিই মরে যাবো। ভাবতে লাগলাম কী হবে আমি যদি মারা যাই?

বন্ধু! তোর মতই আমি স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলাম। আল্লাহকে বিশ্বাস করতাম। পরকালকে বিশ্বাস করতাম। যদিও তা শুধু বিশ্বাস পর্যায়েই আটকে রেখেছিলাম। বাইরে যা দেখা যাবার, তা সেই শুক্রবারেই যা একটু দেখা মিলতো। এস এস সি-তে ‘ফোর্থ’ একটা সাবজেক্ট ছিল। মেইন সাবজেক্টগুলোর তুলনায় যার কোন ভ্যালু ছিলনা। আমার জীবনেও এই আল্লাহর বিশ্বাসকে আমি কেমন জানি ‘ফোর্থ’ সাবজেক্ট বানিয়ে রেখেছিলাম।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, এই ‘ফোর্থ সাবজেক্টটাই’ আমার সেই মৃত্যুর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো। এই ‘ফোর্থ সাবজেক্টই’ আমাকে জানাতে লাগলো, এই মৃত্যু আমাকে দুটি পথের যেকোন একটির দিকে নিয়ে যাবে। চির শান্তি অথবা অসহনীয় যন্ত্রনা। আমার ভেতরের ভীতু স্বভাব বেশ ঝাঁকি খেয়ে উঠলো। সেই ভীতু সত্তা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলো প্রস্তুত হতে। যে কোন একটির জন্যে।

মনে আছে স্কুলে টিফিন আওয়ারের পরের ক্লাসগুলোতে আমরা ব্রয়লার মুরগীর মত ঝিমুতাম? তখন হঠাৎ যদি স্যার তা খেয়াল করতে পারতেন, তাহলে সপাং করে বেত চালাতেন পিঠে; আর আমরা একেবারে মিলিটারি কায়দায় পিঠ টান টান করে ঝপাং করে সোজা হয়ে যেতাম। আমার ভেতরের ভীতু সত্তার সেই ধাক্কা যেন আমাকে তেমনই একটা কিছু করলো। আমি ঝপাং করে নামাজ ধরে ফেললাম। ভাবলাম আর যাই করি, নামাজ বাদ দেয়া যাবেনা। মরলে কবরে কী নিয়ে যাব?

আমি নামাজ পড়া শুরু করলাম। বেশ আত্মতৃপ্তি কাজ করতে শুরু করলো। প্যাড, গ্লাভস পরে ব্যাটিং করতে আমার মত আমিও যেন জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবার প্যাড-গ্লাভস পরে ফেললাম। আর চিন্তা নেই। তাই সমান তালে নামাজ চলছে, সাথে চলছে সেই পুরোনো মুভি, গান, অশালীন আড্ডা; এদিক সেদিক উঁকি ঝুঁকি, জীবনকে রঙ্গিন করার প্রচেষ্টা।

বন্ধু! সব ঠিকই ছিল; কিন্তু আমার ভেতরের ঐ অদ্ভুত ভীতু প্রাণীটা আমাকে আবার প্রশ্ন করতে লাগলো। আমাকে একা পেলেই একটা প্রশ্ন করতো সে- আমি কি দ্বিমুখী? আমি সকালে পুত-পবিত্র হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছি, আর বিকেলে অশালীন গান, মুভি, আড্ডায়, নাচানাচিতে ডুবে যাচ্ছি। একটা কী আরেকটার সাথে যায়? আমি উত্তর দিতে পারতাম না। মেলাতে পারতাম না কিছুই। খুব যন্ত্রণা হত। মানসিক

যন্ত্রণা। লজ্জায় কঁকড়ে যেতাম। অন্যের কাছে অপমানিত হওয়া যতটানা লজ্জার, তার চেয়ে হাজারগুন লজ্জার ব্যাপার হল নিজের কাছে অপমানিত হওয়া। আমি প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজেই অপমান করে যাচ্ছিলাম।

আমি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাইতে লাগলাম। শুরু করলাম জীবনের উদ্দেশ্যকে জানার। বোঝার। আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা শোকর, আল্লাহ আমার জন্যে পথ সোজা করে দিয়েছেন। আমি ধীরে ধীরে এই জীবনকে, তার উদ্দেশ্যকে বুঝতে লাগলাম। নিজের ত্রুটিগুলো শোধরাতে লাগলাম। নিজেকে বদলাতে লাগলাম।

বন্ধু! তোকে হয়তো কয়েকটা লাইনে আমি বোঝাতে পারবোনা আমি কী জানতে পেরেছি। কী বুঝেছি। শুধু এতটুকুই বলব- আমাদের এই ক্ষণিকের জীবনটা কিছুই না দোস্ত। কিছুই না। একটা বিশাল পরীক্ষা কেন্দ্র। তুই, আমি, আমরা সবাই দিনে রাতে এই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের প্রতিটা নিঃশ্বাস পরীক্ষা দিচ্ছে। আমাদের প্রতিটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ রেকর্ড করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা কাজের হিসেব দিতে হবে একদিন। বন্ধু, এই পৃথিবীর জীবন কতটা ছোট তোকে আমি হয়তো বোঝাতে পারবোনা। এই পৃথিবীর বিশালতা দেখে হয়তো তুই বুঝতেও চাইবিনা। তবে আমাদের রাসূল সা. বলে গেছেন- যদি কেউ বিশাল মহাসাগরে তার একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে নেয়, তবে আঙ্গুলটির অগ্রভাগে যেই পানি জমে থাকবে, সেটি হল এই দুনিয়া, আর সমগ্র মহাসাগর হল পরকাল। তুই কি বুঝতে পারছিস বন্ধু? আমরা কতটা ধোঁকার মাঝে আছি? কীসে আমাদের ভুলিয়ে রাখছে এই নির্মম সত্যটি থেকে?

এই মহা পরীক্ষা কেন্দ্রের মহা পরীক্ষক হলেন আল্লাহ। তিনিই আমাদের এই মহা পরীক্ষা নিচ্ছেন। তিনি হলেন রব। রব মানে কি জানিস বন্ধু? তিনিই সবকিছুর মালিক। অর্থাৎ দাবিদার। শুধু আমাদের নামাজ রোজা নয়। আমাদের প্রতিটা কথা, প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা ভাবনার, প্রতিটা দৃষ্টিপাতের ওপর তাঁর দাবি। আমরা শ্রেফ তার আজ্ঞাবা দাস। দাস। শুধুই দাস। এই দাসের কাজ কেবল ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া কিংবা রমজানে রোজা রাখা নয়। এই দাসত্ব ২৪ ঘণ্টার। ৩০ দিনের। ১২ মাসের। সারাটা জীবনের। এই দাস তার প্রতিটা নিঃশ্বাস ব্যয় করবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। এটাকে বলে ইবাদাত। দাসত্ব। কি অদ্ভুত না? আমরা ইবাদাত মানে নামাজই বুঝতাম। তুই বল, দাসত্ব কি শুধু দুই একটা কাজে আটকা থাকে? একজন দাস তার মালিকের আদেশ বিনা প্রশ্নে সাথে সাথেই পালন করে। আমরা ঠিক তেমনই দাস। আল্লাহর দাস। আল্লাহ যা যা আদেশ করেছেন, তা তা বিনা প্রশ্নে মানতে আমরা বাধ্য। কারণ আমরা দাস। তুই কি বুঝতে পারছিস এই দাসত্বের ব্যাপকতা?

বন্ধু! তুই যতদিন বুঝতে পারছিস না তুই আল্লাহর একজন দাস, ততদিন তোর মনে হবে আমি কেমন জানি হয়ে গেছি। কেমন জানি বদলে গেছি। গোঁড়া হয়ে গেছি। অদ্ভুত হয়ে গেছি। কিন্তু বন্ধু! যখনই তুই অনুভব করবি এই ছোট জীবনটা কিসের জন্যে পেয়েছিস, তখন দেখবি সময় কিভাবে দ্রুত দৌড়াচ্ছে। আমার ভয় হয়, ততদিনে না দেরি হয়ে যায়।

বন্ধু! মরীচিকার লোভে পড়ে যেমন মরুভূমির পথিক পথ হারিয়ে ধোঁকা খেয়ে যায়, তেমনি আমরাও এই পৃথিবীর মরীচিকার পিছে ছুটে ছুটে ধোঁকাই খেয়ে যাচ্ছি। এই দুনিয়ার মরীচিকার কোন শেষ নেই। যত ধরতে যাবি, ততই বেড়ে যাবে তার সংখ্যা। এভাবে শুধু ছুটেই থাকবি। কোনদিন তোর ছোট্ট শেষ হবে না।

বন্ধু! পৃথিবীতে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা কেউই মেনে নিতে পারেনি যে তাদের আশপাশের এত আনন্দ, এত মজা, এত বিনোদন, এত কালার এইসব উপবরণারহম ব্যবসবহংং. এ সবই ধোঁকা। এই জিনিসটা মেনে নিতে পারা আসলেই অনেক কষ্ট। আমি তা ভালো করেই জানি বন্ধু। কিন্তু এটাই সত্য। এটাই বাস্তব।

বন্ধু! ইসলামকে জানার চেষ্টা কর। বোঝার চেষ্টা কর। আমাকে তুই খুব বিশ্বাস করতি। আমি জানি। তাই তোকে বলছি। ইসলামই হল একমাত্র সত্য। চির জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে ইসলাম ছাড়া আর একটা অপশনও নেই। একটাও না। এটা শুধু ধর্ম না বন্ধু। এটা একটা জীবন ধারণা। একটা আদর্শ। একটা চিন্তাধারা। একটা দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বাস কর, ইসলাম মানে কেবল নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত না। এগুলো ইসলামের অংশ মাত্র। ইসলাম একটা সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থায় আমরা তাই করতে পারি, যা কুরআন আর সুন্নাহ সমর্থন করে। আর কুরআন সুন্নাহ যা নিষেধ করে, এই জীবন ব্যবস্থায় তা কিছুতেই করা যায়না।

বন্ধু! মৃত্যুর পরে তো আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো। এটা তো অন্তত তুই জানিস। তবে জেনে রাখ, আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হল একটাই। সেটা হল ইসলাম। বাকি সব বাতিল। বাতিল। বাতিল। বাতিল। বাকি সব চিন্তাধারা আর 'লাইফ স্টাইল' আল্লাহ সৈদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

আমি স্বার্থপর নই। আমি চাইনা আমি নিজেই শুধু পরকাল গোছাই। আমি চাই তুইও থাকবি আমার সাথে। আমরা একসাথেই পরকাল গোছাবো। হয়তো কোন মানবিক বাঁধার কারণে কিংবা আমার অযোগ্যতার কারণে তোকে সবকিছু বলতে পারিনি। দেখাতে পারিনি সত্যের পথ। জানিনা আল্লাহ আমাকে এর জন্যে ক্ষমা করবেন কিনা। তবুও এই এলোমেলো চিঠিটা দিয়ে সেই বাঁধাটা কিছুটা হলেও টপকে যাবার সামান্য চেষ্টা করলাম মাত্র।

তোকেও 'কেমন যেন হয়ে গেছিস' দেখার প্রত্যাশায় তোর সেই বন্ধু, যে তোকে দুনিয়ার চাইতে পরকালেই সফলতর দেখতে চায়।



মৃতব্যক্তির চিঠি

# গত রমজানেও আমি তোমাদের সাথে ছিলাম!!

হাসান ইমতিয়াজ

আমাকে চিনতে পেরেছো? মনে হয় আমাকে ভুলে গেছো? কারণ, জীবিতরা মৃতদের খুব দ্রুতই ভুলে যায়! তোমাদের কি মনে পড়ে গেল রমজানেও আমি তোমাদের সাথেই ছিলাম! আমরা বঙ্গুরা তারাবী ও অন্যান্য নামাজে একসাথে মসজিদে যেতাম... তোমাদের সাথেই তো রোজা-ইফতার করেছি। কত মজাই না করেছি... বিস্কুট... বিস্কুট... জানতে পারিনি যেটিই ছিল আমার শেষ রমজান। কোনদিন কল্পনাও করিনি জীবনের শেষ রমজানটি তোমাদের সাথে কাটাচ্ছি। আহ! যদি জানতাম; তাহলে বিশ্বাস কর যে মাফে অনেক বেশি পরিমাণে নেক কাজ করতাম। দান ঋদকা করতাম; রমজানের ফজিলত-বরকত অর্জনের চেষ্টা করতাম। যদি জানতাম, যে রমযানই হবে আমার জীবনের শেষ রমজান, তাহলে কিছুতেই অবহেলা করে জমাতে হারাতাম না! আগের রমজানের তুলনায় অনেক অনেক বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতাম। আমাকে তোমরা গুনাহের কাছেও ঝেঁষতে দেখতে না; রবং ভাল কাজেই মনোযোগী পেতে। বিস্কুট এখন শত আফসোসও কি আমার তামান্না পূরণ করতে পারবে? তোমাদের মনে আছে গত ঐদে আমরা একে অপরের সাথে মুসাহাফা মুআনাকা করেছিলাম? যদি জানতাম যেটিই হবে আমার জীবনের শেষ ঐদ, তাহলে আগ্রহ ভরে তোমাদের বিদায়ী অভ্যর্থনা জানাতাম!

বন্ধু আমাকে কি তোমাদের দু'আয় একটু স্বরণ করবে না? আমি তোমাদের একটু দু'আর আশায় কতটা কাঁপে থাকি যদি জানতে... আমি আশা করি তোমরা আমার জন্য এবং সমস্ত মৃতদের জন্য আল্লাহর রহমত ও ঋমার দু'আ করবে! আমনের ভুবন থেকে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছি; এখন প্রতিদান দিবসের পূর্বে না হিসাব কীভাবে হবে, না কোন আমল আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলি- প্রিয়! জীবনের প্রতিটা মিনিট এবং সেকেন্ডকে গণীমত মনে কর; কোননা এর মূল্য যে কত বেশি তা কেই বুঝতে পারে যে তা হারায়। আর পরবানের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে ভুল না। জেনে রেখ, উত্তম পাথেয় তাকওয়া ওথা খোদাভীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। যারা তোমাদের দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। শোন, আজ যে মৃত্যু পরোয়ানা তোমাদের জিঞ্জিষে অন্যদের দরোজায় কাজ নাড়ছে এটা থেকে আনন্দিত হয়ো না যেন। কারণ, অচিরেরই তা অন্যদের ছেড়ে তোমার দরোজায় আমাতি হানবে। সুতরাং প্রস্তুত থাক। দুনিয়ার মায়া করছ? এতো হল পারাপারের পথ মাত্র। বসবাসের স্থান তো পরোবাল- দুনিয়া নয়। স্মরণে এ সময় থেকে গভ্যাবোর পাথেয় যত পার অর্জন কর।

প্রিয় বন্ধু! ধরে নাও এটিই তোমার জীবনের শেষ রমজান। এ অনুরোধ যেন তোমাকে এ মাসের মথামথ সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং রমজানের পরও যেন তা প্রিয়ালীন থাকে।

তাদের মত যেন না হও, যাদের কথা মহান আল্লাহ তাঁআলা পবিত্র কুরআনে বিবৃতি করেছেন- ‘হে আল্লাহ দয়া করে একটি বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিন, যেন পাপের প্রয়ান্তিভস্বরূপ বেশি বেশি ভাল কাজ করে আসতে পারি।’

ওয়াস্বালাম....



# মুসলিম নারীর রমযান পরিকল্পনা

-উম্মে হাফসাহ

মহিলাঙ্গন



**সকল** প্রশংসা কেবল আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি আমাদের উপর রমযানের সিয়াম ফরজ করেছেন তাকওয়া হাসিলের জন্যে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, রমযানে যার ইবাদত অন্য মাসের তুলনায় বহুগুন বেড়ে যেত।

সন্মানিত বোন ! বর্তমানে আমরা এমন একটি ফিতনার যুগে এসে পৌঁছেছি, যখন সিয়াম সম্পর্কে বহু মানুষের ধ্যান ধারণা পাল্টে গেছে। তারা এই মাসকে খাবার-দাবার, পান-পানীয়, মিষ্টি-মিষ্টান্ন, রাত জাগা ও স্যাটেলাইট চ্যানেল উপভোগ করার মৌসুম বানিয়ে ফেলেছে। এর জন্য তারা রমযান মাসের আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে; এই আশংকায় যে- কিছু খাদ্যদ্রব্য কেনা বাদ পড়ে যেতে পারে অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এভাবে তারা খাদ্যদ্রব্য কেনা, হরেক রকম পানীয় প্রস্তুত করা এবং কী অনুষ্ঠান দেখবে, আর কী দেখবে না সেটা জানার জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর প্রোগ্রামসূচী অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুতি নেয়। অথচ রমযান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই তারা অজ্ঞ। তারা এ মাসকে ইবাদত ও তাকওয়ার পরিবর্তে উদরপূর্তি ও চক্ষুবিলাসের মৌসুমে পরিণত করে।

অপরদিকে কিছু মানুষ রমযান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন। তারা শাবান মাস থেকেই রমযানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ শাবান মাসের আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

রমযান এলেই রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য, রমযানকে সুন্দরভাবে পালন করার জন্য আমরা কত রকম পরিকল্পনা করে থাকি আরো সাথে থাকে ঈদের বাড়তি আনন্দ। রমযান পালন আর ঈদের আনন্দ এ সব কিছু মিলিয়ে প্রতিটা গৃহিণীর মনে থাকে অন্যরকম একটা ভালো লাগা। আর এ ভালো লাগার পুরো আনন্দ পেতে সারা মাস জুড়ে থাকে ব্যস্ততা যা সব কিছুকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নতুনত্ব আনার একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু অনেক গৃহিণী রমযানের শুরুতেই অপরিকল্পনার কারণে কিছুটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। করি করছি করব করতে করতেই এ মাসটা শেষ হয়ে যায়, শেষে আফসোস থেকে যায়, ইসস! কিছুই করতে পারলাম না।

সেজন্য সব গৃহিণীদের অবশ্যই বিশেষ কিছু কিছু পরিকল্পনা করতে হয় যাতে রমযান এবং ঈদের আনন্দ দুটাই পুরোপুরি উপভোগ করে মনে প্রশান্তি পাওয়া যায়। রমযান যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত পাওয়ার মাস তাই পুরো রমযান কিভাবে পালন করে এ মাসটাকে অর্থবহ করে তোলা যায় তার জন্য চাই বিশেষ কিছু পরিকল্পনা।

## রমযান শুরু হওয়ার আগের পরিকল্পনা :

১) রমযান শুরু হওয়ার আগেই ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার কাজ সেরে রাখুন, ঘরে সাজিয়ে রাখা শোপিস, ফুল, পর্দা, রান্নাঘরের কেবিনেট, রেফ্রিজারেটর, ওভেন ইত্যাদি।

২) রমযানের আগেই মুদি দোকানের সব কেনা কাটা করে নিন এবং সব গুছিয়ে রাখুন প্রয়োজনে কৌটার গায়ে জিনিস পত্রের নাম লিখে রাখুন যেন দরকারের সময় অযথা খোঁজাখোঁজি করে সময় নষ্ট না করতে হয়।

৩) যে জামা কাপড় গুলি অনেক দিন জমিয়ে রেখেছেন লজ্জিতে দিবেন বা বাসায় ধুয়ে নিবেন সেগুলি ধুয়ে ইস্ত্রি করে আলমারিতে তুলে রাখুন নয়তো এগুলির জন্য আপনাকে পরিশ্রম এবং টেনশন দুটাই করতে হবে।

৪) বাইরের ভেজাল খাবার না খেতে চাইলে রমযানের আগে কিছু কিছু খাবার দু'চার দিন এক সপ্তাহের জন্য রান্না করে ফ্রীজ আপ করে রাখতে পারেন, যেমন: মাছ, গোসু, ছোলা সিদ্ধ, মিষ্টি দই। এতে করে ঘরের বানানো নির্ভেজাল খাবার খেতে পারবেন এবং কয়েক দিনের জন্য ফ্রী থাকবেন যাতে এই সময়টা ইবাদাতের কাজে লাগাতে পারেন।

৫) সারা মাস জুড়ে চলে ঈদের কেনা কাটার ব্যস্ততা। এই ঝামেলা থেকে মুক্তি রমযান শুরু হওয়ার আগেই পরিবারের সবার জন্য লিস্ট করে ঈদের কেনা কাটা সেরে ফেলুন, এতে একদিকে যেমন সময়কে সুস্থ ভাবে কাজে লাগাতে পারবেন তেমনি বাড়তি খরচ থেকেও মুক্তি পাবেন।

## রমযানের দিনগুলি আমরা কিভাবে কাটাতে পারি তার পরিকল্পনা:

১) প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজ নিয়মিত আদায় করার চেষ্টা করুন, সুন্নত এবং নফল ইবাদাত আপনার পক্ষে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিন। সন্তানদেরকেও ইবাদতে অভ্যাস গড়ে তুলুন। রমযানের শেষ দশ দিনে ইবাদাত যেন বেশি বেশি করতে পারেন তার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন।

২) শুধু মাত্র কুরআন খতমের দিকে লক্ষ্য না রেখে কুরআন অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন। যাতে আল্লাহ তায়ালা কুরআন আমাদের জন্য কেন নাখিল করেছেন, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে কী কী বিধিবিধান রয়েছে সেটা বুঝতে পারেন।

৩) সন্তানদের রোজা রাখার জন্য তাগিদ দিবেন। গেমস কম্পিউটার চালানো থেকে তাদের বিরত রেখে কুরআন পড়ার প্রতি উৎসাহ দিবেন এবং নিজে তাদের সাথে বসবেন।

৪) আমরা কেউ ভুল ভ্রান্তির উদ্বেগে না তাই নিজের দোষ গুলি খুঁজে বের করুন, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং অন্যকে ক্ষমা করার চেষ্টা করুন। গীবত চোগলখুরি আর ঝগড়া বিবাদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। ৫) খাবার দাবারের কাজে নিজেকে এতটা ব্যস্ত রাখবেন না যাতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং রাতে তারাবী নামাজ পরতে অলসতা বোধ করেন। তাই যতটা সম্ভব খাবার তৈরিতে এবং পরিশ্রমের মাঝে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করবেন।

৬) সেহরি খাওয়াটা একটা সুন্নত তাই রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করুন এবং সেহরি খাওয়ার প্রতি সবাইকে উৎসাহিত করুন।

৭) অযথা সারা রাত জেগে থেকে দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটানোর পরিকল্পনা বাদ দিন।

৮) নিজেদের ইফতার থেকে প্রতিদিন অন্তত একজন রোজাদারকে ইফতারী করানোর চেষ্টা করুন, অবশ্যই নিজেদের গরীব আত্মীয়-স্বজনদের থেকে আগে নির্বাচন করবেন, যতটা সম্ভব গরীব আত্মীয়-স্বজনদেও সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করুন।

৯) ইফতারীর সময় কিছুটা হাতে রেখে ইফতারী তৈরির কাজ শেষ করবেন যেন পরিবারের সবার সাথে বসে একসাথে ইফতারী করতে পারেন।

১০) আল্লাহ সমালোচনা করে নিজের সকল গুনাহ, ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা করুন এবং শিরক বিদআত থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে হিদায়েত প্রার্থনা করুন।

১১) নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এ মাসে দান সাদাকা করার চেষ্টা করুন। যাকাত ফিতরা আদায় করুন।

১২) ঘরের বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সুন্নত ও জিকির আয়কার করে আপনার নেকির পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করুন।

১৩) একজন মুসলিমা-এর প্রাত্যহিক জীবন কেমন হওয়া উচিত! দিনের একটা অবসর সময় বেছে নিয়ে আপনার কাছের বান্ধবীদের সাথে নিয়ে বসে আলোচনা সমালোচনা করুন এবং নিজেদেরকে একজন উন্নত মুসলিমা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একে অন্যকে অনুপ্রেরণা দিন।

১৪) সহীহ শুদ্ধ ভাবে দ্বীনের জ্ঞান লাভের চেষ্টা করুন। দীনের দাওয়াত দেয়ার কোন সুযোগ পেলে সেটা হাতছারা করবেন না যথাসাধ্য চেষ্টা করুন সহীহ ভাবে অন্যকে জানাতে।

১৫) রোজা থাকা অবস্থায় দোয়া কবুল হয় তাই এ সময় বেশি বেশি করে দোয়া করুন, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, বাবা-মায়ের জন্য, সকল মুমিন মুসলিমদের জন্য।

১৬) বেশী বেশী ইস্তেগফার-তাওবা করুন।

১৭) বেশি বেশী দান করুন।

১৮) নিজের, সকল মুসলিমদের জন্যে বিশেষভাবে সারা দুনিয়ার মুজাহিদদের জন্যে বেশি বেশি দোয়া করুন।

১৯) জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চান।

২০) আল্লাহর কাছে একান্তে কান্নাকাটি করে বিনয়ের সাথে দোয়া করুন এবং দোয়া করুন এ পরিকল্পনাগুলো যেন সার্থক ভাবে পালন করে সফল হতে পারেন। পরিশেষে আরো একটি পরিকল্পনা থেকে যায় সেটা হল -এ মাসে নিজেকে যেভাবে চালিয়ে নিয়েছেন পরবর্তী দিনগুলিও যেন সেভাবে চালানোর চেষ্টা করতে পারেন এর জন্য একটা পরিকল্পনা। কিন্তু সে পরিকল্পনা হোক আপনার নিজের জীবনে যার যার সুযোগ সুবিধা মতো। আল্লাহ আমাদের সবার পক্ষ থেকে রমযান কবুল করুক এবং তার দীনের উপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করুক -আমীন।



আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি সং কাজে খরচ কর, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। আর যদি তা আটকে রাখ, তাহলে তোমাদের অমঙ্গল হবে। তবে তোমাদের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তুমি তিরস্কৃত হবে না। সর্বপ্রথম তোমরা প্রতিপাল্যদের থেকে খরচ করা শুরু করো। -সহীহ মুসলিম: ১০৩৬; তিরমিযী ২৩৪৩

যেদিন প্রথম এই হাদিসটা আমি পড়লাম, একটু চমকে উঠলাম। দম বন্ধ করে কয়েকবার পড়লাম একই হাদিস। বোঝার চেষ্টা করলাম এখানে কী বলা হচ্ছে। সুবহানআল্লাহ! প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস রাখলে সেটা আখিরাতের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে আর আখিরাতে এর জন্য তিরস্কার করা হবে! কী ভয়ানক কথা! আমি ভয়ে ভয়ে আমার রুমের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলাম। আমার আত্মা কেঁপে উঠল। একি! রুম ভর্তি দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় জিনিস! এই রুমের কয়টা জিনিস আমার দরকারে লাগছে? কত জামা-কাপড়, জুতা, বই-খাতা যেগুলোর অনেকগুলো অযথাই পড়ে আছে। অনেকদিন পর পর ব্যবহার করা হয়, অথবা ব্যবহারই হয়ত করা হয়না এরকম জিনিসেরও অভাব নেই।

পরিচিত এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। এক রুমের বাসা। একটা পর্দা দিয়ে ঐ রুমটাকেই ভাগ করা হয়েছে যেন বাইরের লোকজন আসলে ঘরের মেয়েরা পর্দার ওপাশে আড়ালে থাকতে পারে। সেদিন আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, একটা মানুষের বেঁচে থাকতে খুব বেশি কিছুই প্রয়োজন নেই!

‘প্রয়োজন’ এর সংজ্ঞাটা ইসলাম কিভাবে দিয়েছে? আবু আমর উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, আদম সন্তানের তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর অধিকার নেই। তা হলো- তার বসবাস করার জন্য একটি ঘর, শরীর ঢাকার জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি। - তিরমিযী: ৪০৬ / ২৩৪১, মিশকাত: ৫১৮৬

এই যদি হয় আমাদের দুনিয়াবী ‘প্রয়োজন’, তাহলে এর পিছনে এত কেন ছোটা? আসলে আমরা কি শুধুই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাই? নাকি আরও বেশি কিছু চাই? দীনদার মেয়েদের মুখে আজকে শোনা যায়, ইসলাম ‘প্রয়োজনে’ মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা সমর্থন করে।

সুবহানআল্লাহ! কয়জন মেয়ে উপরের তিনটা জিনিস থাকার অভাবে বাইরে গিয়ে চাকরি করছে?

হযরত আয়শা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সা. এর ইস্তিকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনদিন একটানা দু’দিন পেট ভরে যাবের রুটিও খেতে পায়নি। -বুখারী: ৫৪১৬, মুসলিম: ২৯৭০

ওমার ইবনুল খাত্তাব রাযি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি, দিনভর তাঁর নাড়িভুড়ি পেঁচিয়ে থাকত, অথচ তাঁর পেটে দেয়ার মত সামান্য খেজুরও জুটতো না। -মুসলিম: ২৯৭৮

রাসূলুল্লাহ সা. এর কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমা রাযি. এর হাতে ফোঁস্কা পড়ে গিয়েছিল যব পিষতে পিষতে, যিনি হলেন জান্নাতের নারীদের সর্দারনী। আমাদের অভাব কি এর চেয়েও বেশি? রাসূলুল্লাহ সা. এত অভাব থাকার পরেও তো তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বলেননি!

সত্য কথা হচ্ছে, আমাদের চাওয়াটা শুধু থাকা-খাওয়া-পরার চাওয়া না। আমাদের চাওয়া আরও বেশি কিছু। এক রুমের বাসাতে আমাদের চলবে না। কয়েক রুম থাকা লাগবে। সাজানো সংসার লাগবে। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য বাড়তি ইনকাম লাগবে। মাঝে মাঝে অবকাশ যাপনের জন্য ঘুরতে যাওয়া লাগবে- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে বা কোন দর্শনীয় স্থান! সিলেট-কক্সবাজার-রাঙ্গামাটি-বান্দরবান-পারলে দেশের বাইরে! কয়েক পদের তরকারি ছাড়া আমাদের চলে না। মাছ-গোশত-সবজি-ডাল-ডিম-দুধ সব আমাদের প্রতিদিনের খাবারের লিস্টে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে স্বামী-সন্তান নিয়ে বাইরে দামী রেস্টুরেন্টে, কেএফসি, পিৎজা-হাটে খেতে যাওয়া লাগবে। এন্ড্রয়েড না হলে আমাদের চলেই না। ঘরে ডেস্কটপ দিয়ে যাবতীয় কাজ হয়ে গেলেও ট্যাব-ল্যাপটপও থাকা চাই। আল্লাহর অশেষ করুণায় আমরা যারা দীনের পথে এসেছি, তারা একটু নিজেদের কাপড়ের ড্রয়ারটা খুলে দেখি তো, কয়টা বোরকা আছে আমাদের? ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের, কালারের বোরকা! একেক অনুষ্ঠানে পরে যাওয়ার জন্য একেকটা বোরকা, স্কার্ফ, খিয়ার, কাফতান, ফ্রক আবায়্যা, গাউন আবায়্যা, বাটারফ্লাই আবায়্যা- সবই একসাথে থাকা চাই! আমাদের একেকজনের বিয়েতে আমরা কী এলাহী কাণ্ড করি একবার ভেবে দেখি তো! পাত্র পক্ষের কাছে কনে পক্ষের ডিমাম্বের কথা একবার ভাবুন। হাই স্যালারির জব, সাজানো ফ্ল্যাট, রুমের সাথে অ্যাটাচড বাথরুম, গাড়ি থাকা লাগবে। ২০-৩০ লাখ টাকা দেন-মোহর। বিয়ে ঠিক হলে চার-পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, শাড়ি-অলংকার থেকে শুরু করে গাড়ি সাজানো, বাসর ঘর সাজানো কিছু বাদ রাখি না! বিলাসিতার সাগরে ডুব দিয়ে আমরা এই আমাদেরকে দিয়েই আল্লাহর দীন কায়েমের স্বপ্ন দেখি, শাহাদাতও লাভ করতে চাই, জান্নাতও পেতে চাই! নিজের সাথে কি নির্মম উপহাস!



আমার কথায় রাগ করছেন? ওয়াল্লাহি! এইসব আমার কথা না, কুরআন-হাদিসের কথা।

‘ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও অহংকার তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না কবরে পৌঁছে যাও।’ -সূরা আত-তাকাসুর: ১

আমর ইবনে আওফ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করছি না, বরং এই ভয় করছি যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য তোমাদের সামনে প্রসারিত করা হবে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে করা হয়েছিল। ফলে তারা লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও তেমন লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই দুনিয়াবী প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছে, তেমন তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে। -বুখারী: ৩১৫৮, মুসলিম: ২৯৬১

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, জেনে রাখো, দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুই অভিশপ্ত। কিন্তু, আল্লাহ তাআলার যিকির ও তিনি যা পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী (অভিশপ্ত নয়)। -তিরমিযী: ১৮৯১/২৩২২, মিশকাত: ২১৭৬

কা’ব ইবনে ইয়ায রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, প্রত্যেক জাতির জন্য একটা ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হল সম্পদ। -তিরমিযী: ১৯০৫/২৩৩৬

কা’ব ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, সম্পদ ও অভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার দীনের যে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে, বকরীর পালে ছেড়ে দেয়া দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়েও বকরীর পালকে তত ক্ষতি করতে পারে না। -তিরমিযী: ১৯৩৫/২৩৭৬, মিশকাত: ৫১৮২

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সা. বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের বেশিরভাগই নিঃশ্ব-দরিদ্র। আর সম্পদশালীদেরকে আটকে রাখা হয়েছে (জান্নাতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না)। -বুখারী: ৫১৯৬, মুসলিম: ২৭৩৬

এখন দেখি তো আমাদের সালাফদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? আল্লাহর রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবা রাযি. রা তাঁদের স্ত্রীদের দেন মোহর দিয়েছিলেন মাত্র চারশ দিরহাম, এর থেকে কমও ছিল। প্রিয় রাসূল সা. তাঁর স্ত্রীদের এত ছোট ছোট ঘরে রাখতেন যে তিনি যখন তাঁর কোন একজন স্ত্রীর ঘরে নামাজে দাঁড়াতেন, সেজদাহ করার সময় তাঁর সেই স্ত্রীকে পা ভাঁজ করে রাখতে হত। সামান্য যবের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর বর্মটি দিনের পর দিন বন্ধক রাখতেন।

তাঁর পরিবারের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় এক সা’ গমও জুটতো না। রাসূল সা. চাটাইয়ের উপর শুয়ে ঘুমাতেন যার কারণে তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেত।

সালমান ফারসী রাযি. একজন কিন্দি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। শ্বশুরালয়ে সাজানো বাসর ঘর তিনি পছন্দ করলেন না। তাঁর আদেশে সব সাজ-সজ্জা খুলে ফেলা হল। বাসর ঘরে বহু জিনিসপত্র দেখে তিনি বললেন, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ সা. আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, দুনিয়ায় তোমার জিনিসপত্র যেন একজন মুসাফিরের সাজ সরঞ্জামের মত হয়।

সালমান ফারসী রাযি. একজন কিন্দি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। শ্বশুরালয়ে সাজানো বাসর ঘর তিনি পছন্দ করলেন না। তাঁর আদেশে সব সাজ-সজ্জা খুলে ফেলা হল। বাসর ঘরে বহু জিনিসপত্র দেখে তিনি বললেন, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ সা. আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, দুনিয়ায় তোমার জিনিসপত্র যেন একজন মুসাফিরের সাজ সরঞ্জামের মত হয়।

আবু দারদা রাযি. এর কন্যা দারদাকে ইয়াজিদ ইবনে আবু মু’আবিয়া বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে, আবু দারদা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একজন অত্যন্ত দরিদ্র দীনদার যুবকের সাথে কন্যার বিয়ে দেন। তিনি কেন এই কাজ করলেন জিজ্ঞাসিত হলে আবু দারদা রাযি. উত্তর দেন, আমি আমার মেয়ের দীনদারীর কথা চিন্তা করেছি। ইয়াজিদের সংসারে মাথার কাছে থাকবে গোলাম, চোখের সামনে থাকবে জৌলুস। সেই সময় আমার মেয়ের দীনদারী কোথায় থাকবে?

আবু যার গিফারী রাযি. এর বাড়িতে এক লোক এসে তার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ‘আবু যর, আপনার সামান্য-পত্র কোথায়?’ আবু যর রাযি. উত্তর দিলেন, ‘আখেরাতে আমার একটি বাড়ী আছে। আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিই’।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রাযি. এর স্ত্রীর মিষ্টি খাওয়ার খুব ইচ্ছে হল। তিনি স্বামীকে মিষ্টি কিনে আনতে বললেন। সারা মুসলিম জাহানের আমীর আবু বকর রাযি. জানালেন তার মিষ্টি কেনার সামর্থ্য নেই। খলীফাতুল মুসলিমীনের স্ত্রী এরপর প্রত্যেক দিনের খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে জমা করা শুরু করলেন। কিছু অর্থ জমা হওয়ার পর তা স্বামীকে দিয়ে বললেন মিষ্টি কিনে আনতে। আবু বকর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে? স্ত্রী বললেন, প্রতিদিনের খরচ থেকে বাঁচিয়ে তিনি এই অর্থ জমা করেছেন। আবু বকর রাযি. তখন বললেন, এটার তো তাহলে আমার আর দরকার নেই! এই পরিমাণ অর্থ তাহলে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছি। এরপর তিনি সেই অর্থ স্ত্রীর জন্য মিষ্টি কেনার বদলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে আসেন।

ওমার রাযি. এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাযি. পিতাকে একবার দাওয়াত দিলেন। ওমার রাযি. খেতে বসে দেখলেন খাবারে আছে মাংস, রুটি আর ঘি। ওমার রাযি. উঠে পড়লেন এবং বললেন, আমি খাব না। মাংস থাকার পরও তুমি ঘি আনলে কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার বললেন, আমি আপনার জন্য যে টাকা নিয়ে মাংস কিনতে গিয়েছিলাম সেটাই খরচ করেছি। মাংস সন্তায় পেয়ে যাওয়ায় বাকি টাকা দিয়ে ঘি কিনে এনেছি। তখন ওমার রাযি. বললেন, ‘ওয়াল্লাহি! আমি রাসূল সা. কে কোনদিন এক তরকারীর বেশী দিয়ে খেতে দেখিনি।’

এই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাযি. আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল থাকার পরেও জীবনে কোনদিন পেট ভরে আহার করেননি রাসূল সা. এবং তার পিতা ওমার রাযি. এর ক্ষুধার কষ্টের কথা স্মরণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাসূল সা. কে এত কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন যে আয়েশা রাযি. তার সম্পর্কে বলেছিলেন, ইবনে ওমারের মত আর কেউ রাসূলুল্লাহ সা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না।

আসহাবে সুফফার সাহাবারা এত ক্ষুধার্ত থাকতেন যে নামাজে দাঁড়িয়ে তারা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে ঢলে পড়তেন। নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সা. তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, যদি তোমরা জানতে পারতে যে, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কী মর্যাদা ও সম্পদ সঞ্চিত আছে, তাহলে ক্ষুধা ও অভাব আরো বৃদ্ধি পাওয়াই তোমরা পছন্দ করত। -তিরমিযী: ১৯৩০/২৩৬৮

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. এর সামনে ইফতারের সময় খাদ্য পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন, মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. শহীদ হয়েছেন এবং তিনি আমার চাইতেও ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত একটি চাদর ছাড়া কোন কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিল না। তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করা হলে পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেত এবং পা আবৃত করা হলে তাঁর মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। তারপর আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হল। ফলে আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আমাদের সং কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দেয়া হচ্ছে নাকি। তারপর তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি খাবার খেলেন না। - বুখারী: ১২৭৫

উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো যেখানে ধনী হওয়ার কারণে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন এই ভেবে যে, তাদের সমস্ত আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। সেখানে আমরা উম্মতের তুচ্ছ কিছু মানুষ ধনবান হওয়ার ব্যাপারে কোন আতংক অনুভব করিনা। উল্টো ধনী সাহাবী রাযি. দের কথা বলে আমাদের ভোগ-বিলাসিতার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করি। সুবহানআল্লাহ!

ধনবান হয়েও সেই ধন-মাল উপভোগ করতেন না আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা। সারাক্ষণ এ চিন্তায় যে, থাকতেন কিভাবে আল্লাহর দেয়া সেই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকাহ করে দেওয়া যায়।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেন, আমার নিকট উহূদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি থাকে এবং আমার ঋণ পরিশোধের সম-পরিমাণ ছাড়া তিনদিন অতিক্রম হতে না হতেই আমার নিকট এর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এতেই আমি সন্তুষ্ট হবো। -বুখারী: ২৩৮৯, মুসলিম: ৯৯১

আসমা বিন আবু বকরের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়েশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু'জনের দানপ্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ ছিল।

আমার খালার স্বভাব ছিল, প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে, যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সব গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা'র স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।'

যুগে যুগে মুসলিমদের এই দুনিয়া বিমুখ জীবনের কারণেই তারা আল্লাহর দীনকে এই জমিনে ছড়াতে পেরেছিলেন। আর রাসূল সা. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এই সরলতা আর সাদামাটা জীবনের কথাই বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'মুমিনেরা অতি সাধারণ এবং অনুগত উটের মত সহজ। যখন তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন অনুসরণ করে, আর যখন শক্ত পাথরের ওপর বসানো হয় তখনও তা বসে পড়ে।' - তিরমিযি: ৫০৮৬

দীনের পথে আসা আমার প্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা! আমার নিজের এই আত্ম-উপলব্ধিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার কারণ- আমি জানি, আপনারা অন্তর দিয়ে আল্লাহর দীনকে কত ভালবাসেন, আপনারা আল্লাহর দীনকে আল্লাহর জমীনে কায়েম করতে চান, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বিশাল দায়িত্ব পালনে নিজেকে কুরবানী করতে চান, মাশাআল্লাহ! আপনারা আল্লাহর সৈনিক হতে চান! সুবহানআল্লাহ! আল্লাহর সৈনিক! যেমন তেমন বিষয় না! অনেক বড় কিছু। আল্লাহর সৈনিকেরা তো আর দশটা সাধারণ মুসলিমের মত হতে পারে না। তাদের জীবন হবে অন্যরকম। হ্যাঁ, একদম অন্যরকম। আমরা ভোগ-বিলাসিতাকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিব। বেঁচে থাকতে যতটুকু আসলেই 'প্রয়োজন' এর বেশি কিছু আমরা কখনো পেতে চাইব না। না আমরা প্রাধান্য দিব আমাদের কোন শখ-আহ্লাদকে। হতে পারে আমাদের কারো ভাল ভাল খাওয়ার শখ, কারো শখ ঘুমানোর, কারো সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের কাপড়-চোপড় আর গয়নাগাটির শখ; কারো শখ ঘর সাজানোর কিংবা কারো দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর শখ ইত্যাদি। কোনদিন শুনছেন কোন সাহাবী রাযি. তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে দেশে বিদেশে ঘুরতে গিয়েছেন? এটা বললাম এই কারনে যে, আমার নিজের শখ হচ্ছে, ঘুরে বেড়ানো। আমরা আমাদের এইসব শখ-আহ্লাদকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করব আল্লাহর সৈনিক রূপে।

আবু উমামা ইয়াস ইবনে সালাবা আল-আনসারী আল-হারিসী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবীগণ তাঁর কাছে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা কি শুনছো না, তোমরা কি শুনছো না আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করা ঈমানের লক্ষণ, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করা ঈমানের নিদর্শন? (অর্থাৎ সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন)।' -আবু দাউদ: ৪১৬১, ইবনে মাজাহ: ৩৩২৪/৪১১৮

## আপনার জিজ্ঞাসা ও আমাদের জবাব



**প্রশ্নঃ** রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনার হুকুম কী ?



**উত্তরঃ** রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা এক কথায় কুফরী।

নিম্নে এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ফতোয়া তুলে ধরা হল:

১. আল্লামা জাস্‌সাস রহ. এর ফতোয়া: আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

‘কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দাও সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। - সূরা নিসা: ৬৫

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ মুফাস্সীর আল্লামা জাস্‌সাস রহ. বলেন-

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله - تعالى - أو أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه ، أو من جهة ترك القبول ، والامتناع عن التسليم ؛ وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسي ذراهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. - أحكام القرآن للجصاص

অর্থ: এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোন একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তাঁরা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। তাদেরকে হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দীর বিধান দিয়েছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নিবে না সে ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। - আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস: ৩/১৮১

নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান না মেনে নেবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস রহ. বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।’ আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে এবং শ্লোগান তুলছে- ‘ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার।’ আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের



২. আল্লামা আলুসী রহ. এর ফতোয়া: আল্লামা আলুসী রহ. বলেন-

لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول هو أوفق بالحكمة، وأصلح للأمة، ويتميز غيظاً ويتعصب غضباً إذا قيل له في أمر الشرع فيه كذا. كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها، ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقاصاً للحق

অর্থ: সন্দেহাতীতভাবে ঐ ব্যক্তি কাফের, যে অন্য কোন বিধানকে ভালো মনে করে এবং তাকে শরীয়তের উপর অগ্রাধিকার দেয়। আর বলে- এটাই বাস্তবসম্মত ও উম্মতের জন্য কল্যাণকর। যদি তাকে কোন বিষয়ে বলা হয় এখানে তো শরীয়তের বিধান এমনটি ছিল, সে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। যেমনটি আমরা কতক ব্যক্তির মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ যাদেরকে লাঞ্চিত করেছেন, তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন বিধানকে পছন্দ করে এবং শর'য়ী বিধানকে অসম্পূর্ণ ভেবে সেই বিধানকে শরীয়তের উপর প্রাধান্য দেয় তাকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা অনুচিত। -তাফসীরু রুহুল মা'আনী, খন্ড:২৮, পৃষ্ঠা:২০

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর ফতোয়া:

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন-

.. إنكار المتواتر، عدم قبول إطاعة الشارع، ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاً، ورد للشيعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه، قال في "الصارم المسلول": وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعرف الله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك، ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراعاة ومشتباه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألزمه، وأبغض هذا الحق، وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد اهـ وقال: وقد قال الإمام أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف "بإبنازهوية"، وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله، أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو دفع شيئاً ما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله اهـ

অর্থ: মুতাওয়াতীর বিষয়কে অস্বীকার করা, শরীয়ত প্রণেতার (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) আনুগত্য গ্রহণ না করা এমনকি তা আক্কাঁদাগত বিষয়গুলোতেও এবং শর'য়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা যদিও তা মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে হোক- তা হবে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরি। 'সারিমুল মাসলুলের' মধ্যে শায়খুল ইসলাম রহ. বলেন, 'যে সকল বিষয়কে সত্যায়ন আবশ্যক তা জানা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো এসতেহলাল (হারামকে হালাল মনে করা) হতে পারে ঔদ্ধতাবশত বা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে। আর এটিও কুফরী। কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর নির্দেশসমূহ জানতে পেরেছে। মুমিনরা যা কিছু সত্যায়ন করে সেও তা সত্যায়ন করেছে। কিন্তু তার চাহিদা ও মন মতো না হওয়ার কারণে সে এগুলো অপছন্দ করে ঘৃণা করে। সে বলে, আমি এগুলো মানতে পারব না। আঁকড়ে ধরবো না। এই সত্যকে সে অপছন্দ করে, তা থেকে পলায়ন করে। এই শ্রেণীটি ১ম শ্রেণী (যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে) থেকে ভিন্ন। এদের কাফের হওয়ার বিষয়টি দীন ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পুরো কুরআন জুড়ে এধরনের ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং এদের শাস্তি আরও কঠিন বলে বর্ণিত হয়েছে।' ইমাম আবু ইয়াকুব ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল হানজালী রহ. যিনি 'ইবনে রাহওয়াইহ' নামে পরিচিত। আমাদের ইমামদের একজন, যাকে শাফেঈ রহ. ও আহমাদ রহ. এর সাথে তুলনা করা হয়, তিনি বলেন, 'সকল মুসলমান একমত পোষণ করেছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ বলবে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চয় সে কাফের। এ-ই তার বিধান, যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে। [এছাড়াও আল্লামা কাশ্মীরী রহ. আরো দলিল পেশ করেছেন। দেখুন- ইকফারুল মুলহীদীন; পৃষ্ঠা-১১৯/১২০ প্রকাশনা:ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

নির্দেশনা:

১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রচলিত একটি সংশয়ের নিরসন হয়। তা হলো, রিদ্দাহ (ইসলাম ত্যাগ) সর্বদা বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে না; বরং অনেক সময় মানুষের থেকে এমন কাজ প্রকাশ পায় যার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়, যদিও বা সে মৌখিকভাবে আল্লাহর সকল বিধানাবলীকে স্বীকার করে নেয়। যেমনটি তিনি বলেছেন-

وإن لم يكذب، وهو كافر بواج بنفسه

‘যদিও বা সে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে, তথাপি উক্ত কাজটি কুফরে বাওয়াহ।’

২. ইসলামী শরীয়ত যদি সে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মেনে নিতে অসম্মতি জানায়, অন্য কোন সংবিধানকে নিজ জীবন বিধান বানিয়ে নেয়, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেছেন-

ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كافر بواج بنفسه

‘এবং শরীয় বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে তথাপি তা স্বয়ং কুফরে বাওয়াহ বা সুম্পষ্ট কুফরি।’

ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া রহ. বলেন-

أودفع شيئاً ما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقرباً بما أنزل الله اهـ

‘অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চয় সে কাফের। এই তার বিধান যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে।’ হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর ফতোয়া- আল্লামা তকী উসমানী দা.বা. তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীমে

‘জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ’ নামক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি প্রসিদ্ধ ফক্বীহ হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর বরাত দিয়ে অবস্থাভেদে শাসকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। শাসকদের সপ্তম প্রকারের ব্যাপারে তিনি বলেন-

والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعمداً إلى دين الناس، فيكرههم على المعاصي، وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله، ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكماً، وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية، إما تفضيلاً لها على شرع الله، وذلك كفر صريح، أو توانياً، وتكاسلاً عن تطبيق شريعة الله؛ بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفافاً لها في القلوب، فإن مثل هذا التواني والتكاسل، وإن لم يكن كفراً صريحاً بحيث يكفر به مرتكبه، ولكنه في حكم الكفر. بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم، لأنه من أعلام الدين، وفي تركه استخفاف ظاهر به (راجع باب الأذان من رد المحتار (1/384) (وحيث يُلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث وهو الكفر البواح).

শাসকদের সপ্তম শ্রেণী হলো- ঐ শাসক যে এমন পাপে লিপ্ত হয় যা মানুষের দীন ব্যাপারে প্রভাব ফেলে, অর্থাৎ সে তাদের গুনাহের কাজে বাধ্য করে। (আর الإكراه তথা এই বাধ্য করার বিস্তারিত বিধান যথা স্থানে রয়েছে)। এই الإكراه তথা পাপ কাজে বাধ্য করা কখনো কখনো হয়তো কুফরে হাকীকী হবে বা কুফরে হুকমী হবে। আর এর দৃষ্টান্ত হলো- এমন শাসক যে ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রণয়ন করে। হয়তো সে এটা করে আল্লাহর

শরীয়তের উপর সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে, তাহলে এটা হবে **كفر صريح** অর্থাৎ স্পষ্ট কুফরি। অথবা সে এটা করে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নে অলসতা ও শিথিলতা বশত। এ শাসকের ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই করা হবে; তার অন্তরে শরীয়তের ব্যাপারে অবজ্ঞা থাকার কারণেই তার থেকে শরীয়তের খেলাফ এ ধরনের কাজ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তবে এ ধরনের অলসতা ও শিথিলতাকে যদিও এমন স্পষ্ট কুফর গণ্য করা হবে না, যে কুফরকারীকে কাফের বলে ঘোষণা দেওয়া হয়, তবে এই কাজটি স্পষ্ট কুফরের হুকুমেই হবে। যেমনটি ফুকুহাগণ উল্লেখ করেছেন, ‘যদি কোন শহরবাসী আযান দেয়া ছেড়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বৈধ। কেননা আযান হলো দীনের নিদর্শন আর তা ছেড়ে দেয়া দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ। - রদুল মুহতার ১/৩৮৪ সুতরাং এ প্রকারটিও তৃতীয় শ্রেণীর শাসকদের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো **لكفر البواح** স্পষ্ট কুফর। -তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীম, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬-৩৩১

## নির্দেশনা:

হাকিমুল উম্মত থানভী রহ. এর উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে, ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রাষ্ট্রে দুই কারণে জারি থাকতে পারে:

১. অন্য কোন বিধানকে শর'য়ী বিধানের চেয়ে অধিক উপযোগী মনে হওয়ার কারণে।

২. অলসতা ও শিথিলতা; বশত কুফরি বিধানকে পরিবর্তন করে শর'য়ী বিধান বাস্তবায়ন না করার কারণে। তবে উক্ত সংবিধান উপরোক্ত দুই কারণের যে কোন কারণেই প্রণীত থাকুক **الكفر البواح** তথা স্পষ্ট কুফরেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা শর্তে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হবে। এখানে বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না।

অপর একটি বিষয় হলো, কেউ কি এমনটি কল্পনাও করতে পারে যে, বর্তমান শাসকরা অলসতা বশত ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করছে না। অথচ এ সমস্ত শাসকদের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. তারা একের পর এক শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নতুন নতুন বিধান রচনা করছে। অলসতা বশত পূর্বের সংবিধানের উপর স্থির থাকা সম্ভব, তবে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নতুন নতুন আইন প্রণয়ন কিতাবে সম্ভব হতে পারে!

২. পারিবারিক সামান্য কিছু বিধান যা শরীয়ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আছে তাও তারা সহ্য করতে পারছে না। তার বিরুদ্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করছে এবং তা বিলুপ্ত করার জন্য শত চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এটা কি অলসতা বশত হতে পারে?

৩. শরীয়াহ আইনের দাবীটুকু যারা মানতে নারাজ, তারা এই দাবীকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে আখ্যায়িত করছে। শরীয়াহ আইনের দাবী উত্থাপনকারীদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে জেলে ভরছে, তাদেরকে নানা শাস্তি প্রদান করছে।

৪. জিহাদ, পর্দা, হুদুদ, ক্বিসাস, জাকাত বন্টনের মত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোকে নির্লজ্জের মত স্পষ্টরূপে অবজ্ঞা করছে।

এ ধরনের আরো নানা কুফরী তাদের মাঝে বিদ্যমান এ ব্যাপারে সামান্য সংশয়ের অবকাশ নেই। তাদের ব্যাপারে কোনভাবেই বলা যায় না যে, তারা এটা করছে অলসতা বশত। তাই হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. ও আল্লামা তুফী উসমানীর দা.বা. এর উক্তি অনুযায়ী বর্তমান শাসকরা ঐ শাসকদের মাঝেই গণ্য যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করে না মানব রচিত সংবিধানকে ইসলামী শরীয়তের চেয়ে যুগোপযোগী মনে করার কারণে। সুতরাং তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। ইসলামের সাথে এদের নূন্যতম সম্পর্ক নেই।





## উম্মাহ জেগে উঠেছে

-মাওলানা আসেম ওমর

আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ইসলামী বিশ্বের যে নায়ক অবস্থা ছিলো আজও কি অবস্থা তেমনই রয়ে গেছে?

পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়ানো কুফরারদের সেই দাপট, ফেরাউনিয়্যাত-‘আনা রাব্বুকুমুল আ’লা’ ঘোর প্রতাপশালীদের সেই প্রতাপ কি এখনও আছে, যেমনটি ছিলো এ শতাব্দীর শুরুতে?

ইতোপূর্বে যারা নিজেদেরকে মানুষের জীবন-মরণের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারী ভাবতো, এখনও কি তাদের সেই অবস্থা আছে?

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ মুষ্টিময় মুজাহিদগণ এখনও কি বিগত দশকের ন্যায় অসহায়ই রয়ে গিয়েছেন? তাঁদের নির্বিল্ল বিচরণের জন্য আজও কি কোন ভূ-খণ্ড প্রস্তুত হয়নি?

এখনও কি তাঁরা শত্রুর ধাওয়া থেকে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছেন, নাকি উল্টো শত্রুদের টুটি চেপে তাঁদেরকে ধাওয়া করছেন?

এসব বিষয় যদি নিরপেক্ষভাবে ভাবা হয় তাহলে বলতে হবে যে, তালেবানের বিগত দশ বছরের যুদ্ধ পৃথিবীর চেহারা, শক্তির মানদণ্ড এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক পট পাল্টে দিয়েছে। ব্যাপকভাবে মুসলমানরা কাফেরদের গোলামীর বৈধতার জন্য যে অযুহাত পেশ করছিল যে, আমরা কিভাবে তাদের মোকাবেলা করবো? আমাদের ওপর জিহাদ ফরজ হয় নি। কারণ, কাফেরদের সাথে লড়াই করার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই -এমন সব ভ্রান্ত ধারণা তালেবানদের কুরবানীর বদৌলতে আলহামদুলিল্লাহ পাল্টে গেছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের সামনে আজ এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এখনও যদি মুসলমানগণ ‘জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ’র পথ অবলম্বন করে, তাহলে আবাবো তারা বদর, হুনাইনের চিত্র ফিরিয়ে আনতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

বিগত শতাব্দীতেও যে মুসলিম উম্মাহ লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিগ্রহ নির্বাসনকেই নিজেদের ভাগ্যের পরিহাস মনে করতো, আলহামদুলিল্লাহ আজ সে জাতির বালিকারাও পৃথিবীর বুকে প্রিয় নবীর রষ্ট্রবাস্থাকে, নীতিমালাকে বাস্তবায়নের আওয়াজ সুউচ্চ করছে। উম্মাহর যেসব ভরণ এতদিন নিজেদের বসত-ভিটা, ইজ্জত-সম্মান ভূলুঠিত হতে দেখেও লুকিয়ে বাঁচতো, তারাও আজ নিজেদের প্রজ্জ্বলিত বসত-ভিটার অগ্নি থেকে উম্মাহর শত্রুদের বসত-ভিটায় অগ্নিকাণ্ডের সাহস দেখাচ্ছে।

উসমানী খেলাফতের পতনের পর থেকে সত্তর বৎসর পর্যন্ত শত-কোটিরও বেশী মুসলিম নিজেদের ন্যায় অধিকার পাবার জন্য যখন দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে যাচ্ছে, কুফুরীসংঘ জাতিসংঘের কাছে কাকুতি-মিনতি করছে, এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে উম্মাহর মুষ্টিমেয় একটি দল যখন আল্লাহর পথে জিহাদ শুরু করলো তখন সারাবিশ্বের কাফেররা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মুসলমানদের দাবী-দাওয়া উপস্থাপনের জন্য গণতন্ত্রের ফেরি আরম্ভ করলো ও মুসলমানদের চোখ রাঙানো শুরু করলো।

ফেরাউনের ভাষায় হুংকার ছেড়ে যে আমেরিকা ইরাক ও আফগানে হামলে পড়েছিলো, সে আমেরিকা এখন ঐ নেড়ি কুকুরের মতো নিজেদের ক্ষত চাটছে। অথচ সামান্য পূর্বেও তারা অন্যের খুন ঝরানোর নেশায় ঘেউঘেউ করতো। ন্যাটোর পতাকাতলে যে সকল শয়তানী চক্র জোটবদ্ধ হয়ে খোরাসানের দরিদ্র জনগণকে নির্মূল করার লক্ষ্যে আফগান করে আসছিলো, তারা আজ এমন নির্লজ্জভাবে একে একে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে যে, নিজেদের বাপ-দাদাদের যে সামান্য বীরত্বটুকুও ছিলো তার ওপরও তারা কলঙ্ক লেপন করে ছাড়লো। যে সেনাবাহিনী বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তিদ্র ও দুর্ধর্ষ হিসেবে পরিচিত, যাদেরকে গোটা বিশ্বের সামরিক বাহিনীর মডেল মনে করা হয়, যারা যুদ্ধের নিয়মনীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে; আফগানিস্তানের তালেবানরা তাদেরকে যুদ্ধের এমন কৌশল শিক্ষা দিয়েছে যে, তারা নিজেদের সৈন্যদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য নতুন করে কৌশল নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ দিতে বাধ্য হলো। নিকট অতীত পর্যন্ত আর কোন জাতির মায়েরা এমন বীর বাহাদুর সন্তান জন্ম দিতে পেরেছে? এরপরও কি আমাদের চোখ খুলবে না? এখনও কি জিহাদের কারামাত সুস্পষ্ট হয়নি?

নিকট অতীতেও যে আমেরিকা জিহাদের উপযোগী সুবিধাজনক ও নিরাপদ যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন করে যুদ্ধ পরিচালনা করতো, আল্লাহর সাহায্যে এখন তারা মুজাহিদদের বিশ্ব নেতৃত্বের আঁকা ছঁকে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে।

শক্তির ভারসাম্য দেখুন! নিকট অতীতে আমেরিকার একটু ধমক ও চোখ রাঙানীতে পরমাণু শক্তিদ্র রাষ্ট্রের জেনারেলদের কলিজায় পানি এসে যেতো, অথচ আজ মুজাহিদগণ আমেরিকাকে নিজেদের সাজানো যুদ্ধের ময়দানে এনে ঘোল খেতে বাধ্য করছেন। আর তাই পেট্যাগণের রাঘব বোয়ালগুলোর আত্মা শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন দেশের শরণাগত হুছে- নরম-গরম ভাষায় হাত পেতে সাহায্য প্রার্থনা করছে। কোন দেশই সৈন্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। তবে গোলামী যাদের স্বভাব তাদের কথা ভিন্ন।

মরুর দেশ সোমালিয়াও তাদের অপেক্ষায় আছে। বাকি নবীদের আবাসভূমি, পূর্ণময় সিরিয়া, ফিলিস্তিনেও সুদের ব্যাপারী আমেরিকার আসতে হবে। কালো পতাকাবাহী মুজাহিদদের মোবারক জামাতের যুদ্ধ-কৌশল দেখে মনে হচ্ছে যে, বিশ্ব-কুফরার শক্তিকে আঘাত করার ক্ষেত্রে তাঁরা খোঁরাসানের মুজাহিদদের অনুসরণ করবে। পশ্চিমের মুসলিম দেশসমূহ (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মালি, লিবিয়া) ইহুদি মহাজনদের পুরাতন নিমকখোর ফ্রান্সের কবর রচনার অপেক্ষায় আছে ইনশাআল্লাহ।

রইলো মিসরের কথা! কে জানে, হতে পারে ইসরাইলের সুরক্ষায় নিবেদিত ব্রিটেনের সিংহাসনের সলিল সমাধি লোহিত সাগরেই হবে। আর ধুরন্ধর, ধোঁকাবাজ, ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক থেকে গুটি চালা, আল্লাহ ও মানবতার শত্রু, নবীদের রক্তে রঞ্জিত যাদের হাত সেই নিকৃষ্ট ইহুদি জাতি আজ যখন আল্লাহর সৈনিকদের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত, তখন তারা দীর্ঘস্থায়ী ও কলজে পোড়ানো যুদ্ধের তাপদাহ'র আঁচ পেতে শুরু করেছে। এটি এমন এক যুদ্ধ যার দাবানল তারা শত শত বৎসর যাবৎ প্রজ্জ্বলিত করেছে আর সে দাবানলে অগণিত বনী আদমকে লাশ হতে দেখে নৃত্য করেছে।

দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধে আল্লাহর শত্রুরা নিজেদের শয়তানী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লাখ লাখ বনী আদমের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে ইহুদিদের ট্রামকার্ড ব্যবহার করে। এদেরকে ত্রাস ও নৈরাজ্য ছড়ানোর কাজে উসকে দিয়েছে।

তবে জিহাদের কয়েকটি আঘাতেই আজ তারা নিজেদের ছয়শত বৎসরের আশ্রয়কেন্দ্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। আর সুদীর্ঘ ছয়শত বৎসর পর্যন্ত যে শাসনব্যবস্থাকে তিলে তিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলো, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যার জন্য শ্রম দিয়েছে এমনকি এজন্য নিজেদের ইজ্জত-সম্মান বিকাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। আজ উম্মাহর মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সামান্য কয়েক বৎসরের জিহাদী তৎপরতা ও ত্যাগের ফলে তাদের সেই স্বপ্নের রং মহলে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। এখন সে মহলের দেয়াল খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই এমন সময় আসছে, যে দিন হবে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদগণের বিজয়ের দিন। যেদিন আপনারা এ পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার পতনের আওয়াজ শুনবেন এবং ইহুদিদের ইজারাদারীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র ডলার-পাউন্ডের রাজত্বের অবসান ঘটবে।

এটা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ যে, মুজাহিদগণের জিহাদী তৎপরতা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে এমন নড়বড়ে করে দিয়েছে যে, কোনভাবেই এটা আর চাঙ্গা হওয়া সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হওয়ার কারণে এতদিন যারা সারাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতো, এখন তাদের সে ব্যবস্থাতেই নেমেছে চরম ধ্বস, যা রোধ করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

এখন মাল্টি ন্যাশনালের জাদুকরদের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে- হয়তো তারা মুসলমানদের কাছে চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করে নিবে; তবে মনে হয় তারা এখনও তা করবে না। অন্যথায় যদি তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান লড়াই অব্যাহত রাখতে চায় তাহলে তাদের এ যুদ্ধ বেগবান করার জন্য কাঁচা সোনার হলুদ স্বর্ণমুদ্রা বের করতে হবে, যে স্বর্ণ এতোদিন তারা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কুক্ষিগত করে রেখেছিলো।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান এ লড়াই ডলার-পাউন্ড দিয়ে টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণ তাদেরকে বের করতেই হবে। আর সেদিন ইনশাআল্লাহ চলে এসেছে।

সুতরাং গোটা বিশ্ব জেনে নিক যে, এটা সেই শতাব্দী নয়; যাতে উসমানী খিলাফাহর পতন ঘটেছিলো। বরং এটা এক নতুন শতাব্দী। ইসলামের উত্থানের শতাব্দী। খেলাফত পুনপ্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের নিজেদের শান-শওকত পুনরুদ্ধার আর কুফরের পতন ঘটার যুগ।

এটা খ্রিষ্টীয় একবিংশ শতাব্দী ও হিজরী পনেরতম শতাব্দী। পৃথিবী এখন পূর্বের অবস্থায় নেই, বদলে গেছে অনেক। শক্তির মেরু পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় তো মুসলমানগণ কোমর সোজা করে দাঁড়ানোরও সাহস পেতো না। তাদেরকে গণনাও করা হতো না। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা তো দূরের কথা। কিন্তু কুফরী শক্তি এখন যেমনিভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ উম্মাহর সন্তানরাও মজবুত ও দৃঢ় এক ঐক্য গড়ে তুলেছে। আর তাই এখন কুফরাররা নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলো বাদ দিয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলাম ও মুসলমানদেরকেই তাদের একমাত্র টার্গেটে পরিণত করেছে। তাদের লক্ষ্য ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করা, ইসলামী শরীয়া যেন ফিরে আসতে না পারে তা নিশ্চিত করা। এখন তাদের যুদ্ধ কেবল তাদের সাথে, যারা তাদের রচিত কুফরী শাসনব্যবস্থাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে ও আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে উপলব্ধি করা সহজ; এজন্য চর্মচক্ষুও জরুরী কিছু নয়। তবে যাদের অন্তর্দৃষ্টিই নিঃপ্রভ হয়ে গেছে, বোধশক্তি হারিয়ে গেছে ও চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে- তাদের কাছে এসব ধোঁয়াশাই মনে হবে। জিহাদ ও জিহাদের ফায়দা তাদের বোধগম্য হবে কী করে?

তাদের কাছে চলমান জিহাদী তৎপরতাকে মনে হবে আমেরিকা ও তাদের এজেন্ডার খেলা। আফসোস তো অন্ধের ওপর নয়; বরং আফসোস সে সকল ব্যক্তির ওপর যারা চর্ম-চক্ষু থাকা সত্ত্বেও কিছু দেখে না, আলো-আধার পার্থক্য করতে পারে না, সত্য-মিথ্যা সবই তাদের কাছে সমান। যদি ঈমানী নুর কারো হৃদয়ে থেকে থাকে তাহলে সে বলুক যে, এ যুগে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা কি অসম্ভব?

বর্তমান যুগে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয় তবে তা পরিচালনা করা কেনো সম্ভবপর নয়? এক্ষেত্রে এ ধরনের বোকামীপূর্ণ প্রশ্ন করা থেকেও বিরত থাকা উচিত যে, যদি ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা কিভাবে চালাবেন? আন্তর্জাতিক লেনদেন কিভাবে করবেন? বিচারব্যবস্থাই বা কিভাবে চলবে?

যারা মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে এবং কাদিয়ানী ও কাদিয়ানিয়্যাতকে কুফরী মনে করে তাদের প্রত্যেকের উচিত হলো, হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া। এখন খিলাফাহ ব্যতীত অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র, মতবাদের পিছনে দৌড়ানো মোটেও সমীচীন নয়।

গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার লাশেও পচন ধরেছে। এখন শুধু আল্লাহর বিধান, কুরআনের বিধান যা নিয়ে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরার বুকে আগমন করেছেন তাই পারে এই পৃথিবীকে জুলুম-অবিচারের অষ্টোপাস থেকে রক্ষা করতে। তাই মুসলমানদের উচিত নৈরাশ্য ও হতাশার পথ ছেড়ে আশা ও সাহসের রাজপথে এসে সত্যের অভিযাত্রী অশ্বারোহীদের দলে এসে মিলিত হওয়া। সকল তন্ত্র-মন্ত্র ও ভ্রান্ত মতবাদকে দু'পায়ে দলে মানবতার শত্রুদের বানানো মূর্তি ভেঙ্গে-চুরে আল্লাহর যমীনে একমাত্র তাঁরই শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সাহায্যপ্রাপ্ত দলের সহযাত্রী হওয়া।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুরআনুল কারীম থেকে দূরে সরে যাওয়াই  
বর্তমান মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ।  
শাইখুল হিন্দ

এই উম্মাহর শেষ ভাগের সংশোধন হবে সেই  
পথে যে পথে সংশোধন হয়েছে এই উম্মাহর  
প্রথম ভাগের, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই, অন্য  
কোন উপায় নেই।

ইমাম মালিক রহ.

যদি তোমাদের বাক-স্বাধীনতার সীমারেখা না  
থাকে, তাহলে আমাদের কর্মের স্বাধীনতার  
ব্যপারে তোমাদের অন্তরগুলোকে প্রশস্ত করে  
দাও।

শাইখ উসামা রহ.





## রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী

‘মনে রেখো, ইসলামের চাকা ক্রমশ ঘুরছে। সুতরাং তোমরা যেন কোরআনের পথ ভুলে না বস। শোন, কোরআন আর শাসনক্ষমতা অচিরেই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করবে। সাবধান, কোরআন ছেড়ে বসোনা যেন! ভবিষ্যতে এমন শাসক আসবে যারা তোমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে—যদি তাদের বশ্যতা মেনে নাও, তাহলে নির্ধাত তারা তোমাদের পথহারা করে ছাড়বে। আর যদি তাদের প্রত্যাখ্যান করো, তবে তারা জমদূত হয়ে হাজির হবে। সাহাবী মুআজ রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ পথ ধরবো তা যদি বলে দিতেন? রাসূল সা. বললেন, তোমরা বরং ঈসা আ. এর সহচরদের মতো হয়ে যাও, তাঁরা গুলিতে চড়েছে, জীবন বিপন্ন করেছে; কিন্তু সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়নি।

—তবরানী